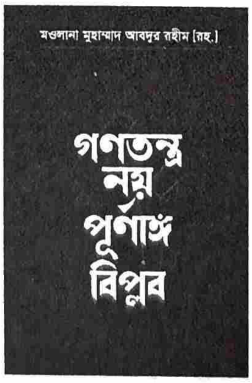
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম [রহ.]



গণতন্ত্র নয় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব

গণতন্ত্র নয় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.)



প্রকাশনায়
ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

সম্পাদকের কথা

বর্তমান দুনিয়ার একটি বহুল আলোচিত মতবাদ গণতন্ত্র। দুনিয়ার এক বিপুল সংখ্যক মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি প্রচণ্ডভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাদের কাছে গণতন্ত্র হচ্ছে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা; এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষ অর্জন করতে পারে তার কাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি তাই? পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মানুষ কি সুখ ও শান্তির দরিয়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত? এ প্রশ্নটি সম্ভবত গণতন্ত্রপ্রেমীরা আদৌ খতিয়ে দেখেন না। তাই গণতন্ত্রের নামে দুনিয়ায় যত শোরগোল উঠছে, মানুষের জীবনে দুঃখ ও দৈন্য ততই বাড়ছে। এমনকি সত্য কথা এই যে, গণতন্ত্রের হোতারাই মানুষকে দুঃখ ও দৈন্যের মুখে ঠেলে দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

এটাই স্বাভাবিক। কারণ, গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব বিস্তারের এক সর্বনাশা প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় মুষ্টিমেয় ধূর্ত ও শঠ প্রকৃতির মানুষ খুব সুকৌশলে বৃহত্তর জনসমাজের উপর প্রভু হয়ে বসে নানা মুখরোচক বুলির আড়ালে সাধারণ মানুষকে দাসানুদাসে পরিণত করে এবং তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। আর হতভাগ্য মানুষ

একেই স্বাধীনতা ও স্বাধিকার ভেবে গণতন্ত্রের জন্য প্রাণপাত করে এবং ধূর্ত ও শঠ লোকদের খেলার পুতুলে পরিণত হয়। অথচ কাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তির মুখ তারা কোনোদিনই দেখে না; তা চিরকাল শুধু সোনার হরিণরূপে ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

এ ভূখণ্ডে ইসলামী আন্দোলনের মহান স্থপতি এবং ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত এ ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিরই বিশদ আলোচনা করেছেন আলোচ্য পুস্তিকায়। তিনি গণতন্ত্রের উৎস, ইতিহাস ও প্রয়োগ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমের এ ভ্রান্ত মতবাদটি দ্বারা মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব বিস্তার ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোনো কল্যাণই সাধিত হতে পারে না। সেটা হতে পারে কেবল ইসলামী আদর্শভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ গণবিপ্লব দ্বারা। অতএব সে কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের লক্ষ্যেই সংগঠিত হওয়া উচিত এদেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত গণমানুষের।

পুস্তিকাটি ১৯৮৫ সালের প্রথম ভাগে রচিত ও প্রকাশিত হলেও দেশের জনমনে বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইতোমধ্যেই এর পাঁচটি সংস্করণ শেষ হয়েছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করছি।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
সাবেক চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম (রহ.) রিচার্স ফাউন্ডেশন

শুরুর কথা

এমন একটি দেশের কথা কল্পনা করা যায়, যেখানকার শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি লোক নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে দাবি করে। যদিও তারা ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে পালন করছে না বা পালন করতে পারছে না। এই পালন না করার কারণ হতে পারে– তারা প্রায় দু'শ' বছর পর্যন্ত ইংরেজদের গোলাম হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছিল। আর ইংরেজরা এ দেশ দখল করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এখানকার মুসলমানদের পূর্ণমাত্রায় 'অমুসলিম' না হলেও 'প্রায় অমুসলিম' বানাবার জন্য ক্রমাগত ও সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করেছে।

মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে তাদের নিজস্ব পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থাকে এখানকার জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে চালু করেছে এবং সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে দেশের শিক্ষার্থীরা সে সব প্রতিষ্ঠানে ভিড় জমিয়েছে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। তার আরও বিশেষ কারণ থাকতে পারে। ইংরেজ শাসকরা নানা কৌশলে মুসলমানদের আর্থিক সচ্ছলতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অতঃপর জীবিকার্জনের সুযোগ লাভ কেবল তখনই সম্ভব বলে মনে করা হলো,

যখন ইংরেজ শাসকদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাদেরই প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাধীন পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করে এবং কোনো না কোনো পর্যায়ের সনদ লাভ করতে সক্ষম হয়। উপরন্তু তারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকার্জনও মুসলমানদের জন্য প্রায় অসম্ভব করে তুলেছিল। তা সম্ভব করে রাখা হয়েছিল শুধু তাদের জন্য, যারা ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এককথায়, ইংরেজ শাসকরা এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজায় জীবিকার চাবি ঝুলিয়ে রেখেছিল। যার ইচ্ছা সেখান থেকে ডিগ্রী লাভ করার পর সে চাবি হস্তগত করতে পারে; জীবিকার বদ্ধ দুয়ার খুলে সুখী-সচ্ছল জীবন-যাপনের সুযোগ পেতে পারে।

ইংরেজরা এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এমন এক শ্রেণির লোক তৈরি করার ব্যবস্থা করেছিল, যারা বর্ণ-বংশে এদেশীয় হলেও চিন্তা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যমান ইত্যাদি সকল দিক দিয়েই হয়েছিল পুরোপুরি ইংরেজ। ইংরেজদের মতোই তারা মনিবসুলভ আচরণ গ্রহণ করেছিল, সাধারণ মানুষকে তারা ঘৃণা করত, তাদেরকে ইংরেজদের মতোই গোলাম বানিয়ে রাখতে শুরু করেছিল।

ইংরেজ শাসকরা পূর্বের সব আইন বাতিল করে গোলাম উপযোগী আইন তৈরি করে তা এদেশে চালু করে দিল। সে আইন-শিক্ষার উচ্চতর ব্যবস্থা এদেশে এবং তাদের নিজেদের দেশে চালু করল। আইন শিক্ষার্থীদের মন-মগজে বদ্ধমূল করে দিল যে, আইন বলতে কেবল ইংরেজদের প্রবর্তিত আইনই বোঝায়। কেবল এ আইনই একালে দেশ শাসনের জন্য একমাত্র উপযুক্ত আইন। এ আইন ছাড়া অন্য সব আইন এমনকি মুসলমানদের নিজেদের আইনও সেকেলে; একালে অচল। এ আইন যারা শিখবে তারাই আইনের ব্যবসা করে একদিকে বিপুল অর্থ রোজগার করতে পারবে, অন্যদিকে জনগণের নেতাও হতে পারবে। কেননা তারাই শাসকদের ভাষা জানে, শাসকদের মন-মেজাজ বোঝে এবং তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। ইংরেজদের দয়ার দান রাজনীতি করার যোগ্যতা কেবল এ আইনের 'জীবী' হলেই লাভ করা যেতে পারে।

ইংরেজরা এদেশে এমন এক অর্থব্যবস্থা চালু করল, যার ভিত্তি স্থাপিত ছিল সূদের উপর। অথচ মুসলমানদের ঈমান– সুদ হচ্ছে কঠিন হারাম

এবং সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ফলে মুসলমানরা দেশে প্রচলিত অর্থনীতির সুযোগ-সুবিধা লাভ করা থেকে হয় বঞ্চিত থাকল, না হয় সুদের মতো হারাম ব্যবস্থায় রোজগার করতে বাধ্য হলো। আর সূদী কারবারে যে জীবিকা অর্জিত হলো, তদ্দরুন একদিকে যেমন হারাম খেয়ে ও পরিবারবর্গকে হারাম খাইয়ে তারা হালাল রিজিক খাওয়ার প্রয়োজন বোধটুকুও নিঃশেষে হারিয়ে ফেলল, অপরদিকে গরীব ও নিঃস্ব লোকদের শোষণ করে নিজেদের বিলাসী জীবন যাপনে তাদের একবিন্দু সংকোচ বা লজ্জাবোধও অবশিষ্ট থাকল না। দরিদ্র জনতার প্রতি থাকল না কোনো দরদ বা সহানুভূতি। তারা নিজেরা যেমন হারাম উপায়-উপকরণের মধ্যে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হলো, তেমনি নিজেদের বংশধরদেরও সেই হারাম জীবিকায় অভ্যস্ত বানিয়ে দিয়ে গেল। ফলে গোটা বংশই সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত হতে থাকল।

ইংরেজদের সাংস্কৃতিক জীবনে মদ্যপান এবং নারী-পুরুষের মিলিত অনুষ্ঠান, নৃত্য সঙ্গীত এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা এ সব অনুষ্ঠানে এদেশের ইংরেজি শিক্ষিত ও ইংরেজভক্ত মুসলমানদের শরীক করে মদ্যপানে অভ্যস্ত করে তুলল; ভিন নারী-পুরুষকে অবাধ মেলামেশা এবং যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত করে দিল। ফলে তাদের নিকট ইসলামের হালাল-হারাম মূল্যহীন, বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তুতে পরিণত হলো; মুহররম-গায়র মুহররমের মধ্যে কোনো পার্থক্য বোধও থাকল না, যার পরিণতিতে তারা ইসলাম-বিরোধী একটি শ্রেণিতে পরিণত হলো।

শিক্ষাব্যবস্থায় যুবক-যুবতীদের সহশিক্ষার প্রবর্তন করে ইংরেজ শাসকরা মুসলমান বংশধরদের মন-মগজে পর্দাব্যবস্থাকে উন্নতি ও প্রগতির পরিপন্থী বা তার পথে প্রচণ্ড বাধা হওয়ার ধারণা বদ্ধমূল করে দিল। তারা একই শ্রেণিকক্ষে পাশাপাশি বা সামনা-সামনি বসে পাঠ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি-পরস্পর প্রেম-প্রণয় ও যৌন মিলনের অবাধ সুযোগ পেয়ে চরম সীমায় পৌঁছে যেতেও দ্বিধাবোধ করল না। ফলে এই শিক্ষিত লোকদের পক্ষে ইসলামের নৈতিক বিধান দুঃসহ ও অনুসরণীয় এবং প্রগতি পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াল।

এভাবে ইংরেজ শাসকরা মুসলমানদের মধ্য থেকে যে লোকদেরকে নিজেদের চিন্তা-চরিত্রের প্রতিভূ বানাতে সক্ষম হয়েছিল, তাদেরকে

মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় বানিয়ে দেবার জন্য নানা বাস্তব প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করল।

এ দেশবাসীর পরাধীনতার সময় যতই অগ্রসর হতে থাকল, ততই এদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার হতে লাগল। বালাকোট ট্র্যাজেডীর পরও সারা উপমহাদেশ জুড়ে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের শিক্ষা ও ইংরেজ বিরোধী জিহাদের জের চলছিল। বিশেষ করে এদেশের আলেম সমাজ ইংরেজ শাসনের অধীন ইসলামের প্রভাব দ্রুত বিলীন হতে দেখে এবং ইসলামের মৌল স্বাধীন বিপ্লবী ভাবধারার চাপে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করতে শুরু করলেন। ইংরেজ বিরোধী তথা স্বাধীনতার এ আন্দোলনে উত্তরকালে ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরাও অগ্রসর হয়ে এল এবং পরবর্তীতে আলেম সমাজের তুলনায় তারাই অধিক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে শুরু করল। এক পর্যায়ে তারাই নেতা হয়ে বসল গোটা মুসলিম সমাজের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ইংরেজরা এদেশীয় লোকদের মাঝে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন প্রবল হতে দেখে নিজেরাই আঁচ করতে পারল যে, এদেশকে আর বেশিদিন পদানত করে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এতদঞ্চল ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য তাদের উপর আন্তর্জাতিক চাপও প্রবল হয়ে দাঁড়াল। ফলে তারা এদেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়া এবং এদেশীয় লোকদের হাতে গোটা শাসন কর্তৃত্ব সোপর্দ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। আর সে জন্য ইংরেজদেরই রচিত ১৯৩৫ সনের স্বায়ত্তশাসন আইনের অধীনে চালু করা প্রক্রিয়াকেই পন্থা হিসাবে অবলম্বন করা হলো।

১৯৩৫ সনে ইংরেজরা এদেশে প্রবর্তিত স্বায়ত্তশাসন আইনের অধীন ইউরোপে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশেষ পরিমাণ 'কর' দাতাদের ভোটার বানিয়ে তাদের ভোটে নির্বাচিত লোকদের দ্বারা প্রাদেশিক পরিষদ গঠন করে। এর ফলে এদেশে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে এবং তার পুরোভাগে বা নেতৃত্বে ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা সাধারণভাবে এবং ইংরেজ-প্রবর্তিত আইনজীবীরা বিশেষভাবে অগ্রসর হয়ে আসে। আর ইংরেজরাও অতি সুকৌশলে এ শ্রেণির লোকদেরকেই

রাজনৈতিক নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে তারাই হয় মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতা।

স্বায়ত্তশাসন আইনের অধীনে ১৯৩৬ সনে প্রথম প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে এ ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজদের এদেশীয় সাগরিদরাই নির্বাচিত হয়। ফলে মুসলিম জনগণের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায় যে, আলেম সমাজ মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা মাত্র, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা নেতৃত্ব দেয়ার উপযুক্ত নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম কেবল ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরাই। কেননা তারাই শাসক ইংরেজদের ভাষা ও আইন-কানুন জানে এবং তারাই ইংরেজ প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সুপরিচিত।

ইংরেজদের চলে যাওয়ার পর

১৯৪৬ সনে প্রাদেশিক পরিষদভিত্তিক আর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনের ফলেই দেশ স্বাধীন হয় এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের হাতে দেশ শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে দিয়ে '৪৭ সনে ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যায়।

ইংরেজ-পরবর্তীকালে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, দেশ বাহ্যত 'স্বাধীন' হলেও দেশবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

কেননা একটি স্বাধীন দেশের মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রধানত দু'টি। একটি তার নিজস্ব জাতীয় আদর্শ এবং অপরটি তার নিজস্ব জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী, অনুসারী ও বাস্তবায়নকারী নেতৃত্ব-সম্বলিত একটি প্রশাসন।

কিন্তু এ উভয় দিক দিয়ে দেশটি নামে স্বাধীন হলেও কার্যত ইংরেজ আমলের মতোই পরাধীন থেকে গেল।

ইংরেজদের চলে যাওয়ার পরও এ দেশটিকে সর্বাত্মকভাবে গ্রাস করে রাখল ইংরেজ-চালিত শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-কানুন এবং প্রশাসন পদ্ধতি। আর সেই সাথে চেপে বসল ইংরেজদেরই মানস সন্তান ইংরেজি শিক্ষিত, ইংরেজদেরই মন-মানস ও চরিত্রের ধারক-বাহক এবং ইংরেজদেরই অন্ধ গোলাম শ্রেণির লোকেরা। তারা ইংরেজদেরই তৈরি

করা আইন ব্যবস্থার দ্বারা ইংরেজদেরই মন-মানস ও চরিত্র নিয়ে শাসন করতে লাগল এ দেশের কোটি কোটি মুসলমানকে। ফলে ইংরেজ আমলে মুসলিম জনগণ এবং তাদের জাতীয় আদর্শ দ্বীন ইসলাম যেরূপ উপেক্ষিত অবস্থায় ছিল, ইংরেজদের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার, অন্য কথায় স্বাধীনতার পরও ঠিক তেমনিভাবে উপেক্ষিতই হয়ে থাকল। মুসলিম জনতা দ্বীন-ইসলামকে জাতীয় আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং নেতৃত্ব থেকে ইংরেজদের মানসপুত্রদের হটিয়ে ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে থাকল।

দেশটির স্বাধীনতার পর

ইংরেজদের চলে যাওয়ার পর প্রচলিত অর্থে এবার এ দেশটি স্বাধীন হলো। কিন্তু সে স্বাধীনতা জনজীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে দেখা দিল না; বরং তখন ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও ইংরেজদের আইন প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুন যে সব জীবন সমস্যা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল, সে সবের সমাধানের জন্য দেশবাসীকে আবার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো এবং দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধের দ্বারা ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে ভেঙে ফেলা হলো। তখন দেশ আরও একবার স্বাধীন হলো। কিন্তু নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে 'এক সাগর রক্ত' দেয়ার পর যে স্বাধীনতা অর্জিত হলো, সে স্বাধীনতাও সাধারণভাবে দেশবাসীর ভাগ্যে এবং বিশেষভাবে মুসলিম জনগণের জীবনে গোলামী জীবনেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাল। এক কথায়, যথাপূর্ব তথা পরং-ই হয়ে থাকল।

দ্বিতীয় বারে অর্জিত স্বাধীনতার পরও নিতান্ত গোলামী জীবন-যাপনে বাধ্য হওয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার! কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, এবারেও যেমন ইংরেজ প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি-কোনো কিছু থেকেই নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না, তেমনি ইংরেজদের মানসপুত্রদের নেতৃত্ব ও দেশ শাসনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুন স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে যে, দেশবাসী এখনও সেই ইংরেজদেরই গোলামি করছে। স্বাধীনতা তাদের ভাগ্যে এখনও জোটেনি।

একথা সত্য যে, সেই ‘সাত সমুদ্র তেরো নদী’র ওপার থেকে আসা সাদা চামড়ার লোকেরা এখন আর সশরীরে উপস্থিত থেকে এদেশ শাসন করছে না। এখন দেশ শাসন করছে যারা, তারা গাত্রবর্ণ ও জন্মসূত্রে এদেশীয় হলেও অন্য কোনো দিক দিয়েই তাদেরকে ‘এদেশীয়’ মনে হয় না- মনে হয় না এসব লোক এদেশের মুসলিম জনসমাজ থেকে বের হয়ে এসেছে। কেননা চিন্তা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ইত্যাদি কোনো একটি দিক দিয়েও এদেশের সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে এদের কোনো মিল নেই। অথচ এরা যে এদেশের মুসলিম পরিবারেরই সন্তান, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। বস্তুত মুসলিম পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সেই মুসলিম সমাজের সঙ্গে মন-মানস, চিন্তা-বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে কোনোরূপ মিল না থাকা ইংরেজদের দীর্ঘকালীন গোলামীর একটা মারাত্মক অভিশাপ। এ দেশের মুসলমানদের বর্তমান সার্বিক দুর্গতি এ অভিশাপেরই স্বাভাবিক পরিণাম। সাধারণভাবে মুসলমানদের পক্ষে পূর্ণ দ্বীন-ইসলাম পালন করতে না পারার মূলেও এ কারণই নিহিত।

এদেশের শাসক-প্রশাসকরা দেশের বর্তমান আইন-কানুন, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রশাসন পদ্ধতিতে একবিন্দু পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত নয়। কেননা তারা বর্তমান পদ্ধতিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেই দেশের প্রশাসক হয়ে বসবার সুযোগ পেয়েছে, যার দরুন তারা ভোগ করতে পারছে বিচিত্র ধরনের সুযোগ-সুবিধা। কাজেই বর্তমান শিক্ষা ও প্রশাসন পদ্ধতি পরিবর্তিত হলে তারা যে তাতে নিজেদের অনিবার্য মৃত্যু ও ধ্বংস দেখতে পাবে, তাতে আর সন্দেহ কী? আর কোনো ব্যক্তি যেমন নিজের হাতে নিজের মৃত্যু ঘটতে দিতে চায় না, তেমনি ইংরেজদের বদৌলতে দেশের উপর চেপে বসা বর্তমান শাসক-প্রশাসকরাও ইংরেজ আমলের স্থিতাবস্থায় কোনো রদবদলে রাজি হতে পারে না- কস্মিনকালেও রাজি হবে না, তা জোর দিয়েই বলা যায়।

অথচ এদেশের মুসলিম জনতা শুধু মানচিত্র বদলই নয়, ইংরেজ আমলের যাবতীয় অভিশাপ থেকেই মুক্তি চায়। তারা ইংরেজ প্রবর্তিত

শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রশাসন-পদ্ধতি ও আইন-কানুনের গোলামী থেকে সম্পূর্ণরূপে আজাদী লাভ করতে চায়। এ দ্বন্দ্বই এদেশের জনগণ ও শাসক-প্রশাসকদের মধ্যে বিরাজমান। সন্দেহ নেই। এ এক কঠিনতম দ্বন্দ্ব। এর নিরসন না হওয়া পর্যন্ত এদেশের কিছুমাত্র অগ্রগতি সম্ভব নয়, সম্ভব নয় স্বাধীনতার একবিন্দু সুফল লাভ করা।

প্রকৃত স্বাধীনতা কীভাবে সম্ভব?

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, এদেশে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-কানুন ও প্রশাসন পদ্ধতি ইংরেজরাই চালু করেছিল। ইংরেজরা তা চালু করতে সক্ষম হয়েছিল শুধু এ জন্য যে, তারাই ছিল এদেশের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী, হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাদের ইচ্ছা ছিল, তারা নিজেরা কখনও এদেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য হলেও অন্তত পরোক্ষভাবে যেন তাদের শাসনই এদেশে বহাল থাকে।

আজকের বাস্তব অবস্থা তাদের সে ইচ্ছারই প্রতিফলন, সন্দেহ নেই। তাই বলতে দ্বিধা নেই, দেশটি 'স্বাধীন' হলেও স্বাধীন নয়- নিতান্তই গোলাম দেশ, পরাধীন জীবন। প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে এমন একটি প্রক্রিয়া এদেশবাসীকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যার ফলে গোলামির উভয় প্রতীক– শিক্ষা-সংস্কৃতি, আইন-কানুন ও শাসন পদ্ধতি এবং ইংরেজদের মানসপুত্রদের নিকৃষ্ট অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হবে।

কিন্তু সে প্রক্রিয়া কী?

ইংরেজ-প্রবর্তিত নিয়মে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকে অনেকে স্বাধীনতার একটি কার্যকর প্রক্রিয়া বলে মনে করেন এবং তদ্রূপ দাবিও করেন। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের যে পদ্ধতি যেভাবে তা বাস্তবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাতে গোলামির উপরিউক্ত প্রতীকদ্বয়ের অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ কোনোদিন সম্ভব নয়।

বর্তমানে দেশে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, আগেই বলেছি যে, তা ইংরেজদেরই প্রবর্তিত এবং ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত। ইউরোপে মধ্যযুগে দেশ শাসনের সমগ্র কর্তৃত্ব ছিল গির্জার এবং গির্জার পাদ্রী-পুরোহিতদের হাতে। তারাই ছিল নিরংকুশ শাসন ক্ষমতা ও ধর্মীয় নেতৃত্বের একচেটিয়া অধিকারী। চতুর্দশ শতকের পর ইউরোপে রেনেসাঁর সূচনা হয়। কয়েক শতাব্দীব্যাপী রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পর শাসন কর্তৃত্ব গির্জা কর্তৃপক্ষের হাত থেকে কেড়ে নেয়া হয়। এরপর বিভিন্ন দেশে নিরংকুশ অত্যাচারী রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠে এবং রাজতন্ত্র উচ্ছেদের আন্দোলন শুরু হয়। সে আন্দোলনের ফলে রাজতন্ত্র উচ্ছন্নে যায় এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে গণতন্ত্র।

পাশ্চাত্যের এ গণতন্ত্রের সারকথা হলো– জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং তাদের উপর নির্বাচিত লোকদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সার্বভৌমত্বের যে সংজ্ঞা দিয়েছে, তার কোনো সুনির্দিষ্ট পাত্র তারা খুঁজে পায়নি। তারা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারেনি, সংজ্ঞানুযায়ী সার্বভৌম কে? তারা মানুষের বাস্তব জীবনে মহান আল্লাহকে স্বীকার করতে প্রস্তুত না থাকার ফলে সার্বভৌমত্বকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রাকৃতিক জগতের উপর মানুষের কোনো কর্তৃত্ব চলে না বলে সেখানে আল্লাহর প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্ব (Natural Sovereignty) স্বীকার করে নিতে তারা কোনো আপত্তি করেনি। তবে মানুষের বাস্তব জীবনের উপর থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব উচ্ছেদ করে সেখানে তারা মানুষের সার্বভৌমত্বকে স্থাপন করেছে সর্বাত্মকভাবে। এ সার্বভৌমত্বকে আবার তারা দু পর্যায়ে বিভক্ত করে নিয়েছে। প্রথমত প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক নাগরিক সার্বভৌম; আর এ সার্বভৌমত্ব কেবল ভোট দানের মাধ্যমেই কার্যকর হতে পারে। দ্বিতীয়ত ভোটদাতাদের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিরা তথা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা সার্বভৌম; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের নেতাই 'পপুলার' সভরেনটি থেকে আইনগত সার্বভৌমত্বের (Legal Sovereignty) মালিক হয়ে থাকে।

এ তত্ত্বের ভিত্তিতে পাশ্চাত্যে বিগত শতকে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ইংরেজরা সে ব্যবস্থাকেই এদেশে চালু ও ক্রমবিকাশ

দান করে গেছে। ফলে এ দেশের শাসন কর্তৃত্ব লাভের রাজনীতি এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চলে এসেছে। জনগণের নিকটও এ পদ্ধতি এতদিনে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতির কথা জনগণ জানে না, খুব একটা বোঝেও না। ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত রাজনৈতিক দলসমূহ এ পথেই ক্ষমতাসীন হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে এবং কখনও কখনও ক্ষমতাসীন হয়েছেও। ফলে এ পথটিকেই ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের একমাত্র পথরূপে গণ্য করা হচ্ছে।

নির্বাচনী গণতন্ত্রের বাস্তব রূপ

শুধু তা-ই নয়। এ ব্যবস্থায় নিয়মিত নির্বাচন হওয়াকেই প্রধানত গণতন্ত্র থাকা মনে করা হয়। আর নিয়মিত নির্বাচন না হলে বা নির্বাচিত ব্যক্তি ক্ষমতাসীন না থাকলে কিংবা সামরিক শাসন কায়েম হলে গণতন্ত্র নেই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

কিন্তু ইংরেজ প্রবর্তিত পাশ্চাত্যের এ গণতন্ত্র ও নির্বাচন পদ্ধতি সর্বতোভাবে একটি সেকিউলার[১] বা ধর্মদ্রোহী ব্যবস্থা। এতে মানুষের উপর প্রশাসনিক ও আইন রচনার ক্ষেত্রে আল্লাহর কর্তৃত্ব স্বীকৃত নয়; তা একান্তভাবে মানুষের করায়ত্ত। এতে রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয়। কুরআন ও সুন্নাহ তথা শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণত কুফরী ব্যবস্থা। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানদার কোনো ব্যক্তি এ ব্যবস্থাকে মুহূর্তের জন্যও মেনে নিতে পারে না। এক ব্যক্তির নিরংকুশ কর্তৃত্ব বা একটি দল অথবা বিশেষ গোষ্ঠীর নিরংকুশ কর্তৃত্বের মধ্যে মৌলিকভাবে কোনোই পার্থক্য নেই। দলীয় কর্তৃত্ব মূলত দলের নেতার কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত করে। মুজিব, জিয়া, সাত্তার ও এরশাদের ক্ষমতায় কোনোই পার্থক্য নেই। এ ধরনের লোকেরা সাংবিধানিকভাবে মানুষের উপর খোদা হয়ে বসে।[২] কিন্তু তারা প্রকৃত খোদা নয় বলে এদের অধিকাংশই ফুৎকারে উড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়নি।

এরূপ অবস্থায় প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহর কথা বাদ দিলেও নির্বাচনী গণতন্ত্র বা গণতন্ত্রের প্রচলিত নির্বাচন দেশে সত্যিই কি কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে?

প্রশ্নটি সম্পর্কে বাস্তবতার নিরিখে একটু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-বিবেচনা করা আবশ্যক।

নীতিগতভাবে বলা যায়, মানুষ মূলত সার্বভৌম নয়। সার্বভৌম হতে চাইলেও কখনই সে তা কার্যত হতে পারে না। কেননা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞানুযায়ী সার্বভৌমকে অসীম-নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী, সর্বাত্মক-সর্বব্যাপী এবং চিরস্থায়ী ও অবিভাজ্য হতে হবে। কিন্তু দুনিয়ার কোনো মানুষ কখনই এসব গুণের কোনো একটিরও অধিকারী হতে পারে না। তাহলে যারাই সর্বোচ্চ শাসন-ক্ষমতায় আসীন হয়- তা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি হোক বা পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে কোনো জাতীয় সংসদ হোক (দু'টিই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে স্বীকৃত)-তারা কেউই প্রকৃত 'সার্বভৌম' নয়। আর প্রকৃত সার্বভৌম না হয়েও দেশ শাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিরংকুশভাবে ব্যবহার করার কোনো অধিকারই তারা পেতে পারে না। অথচ সেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রেই এ ক্ষমতা দেয়া হয় প্রেসিডেন্টকে কিংবা জাতীয় সংসদকে।

তাই আমি বলব, সেকিউলার গণতন্ত্র– যে গণতন্ত্র বর্তমানে দুনিয়ার দেশে দেশে চালু রয়েছে– একটা ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক তথা মিথ্যা শাসন ব্যবস্থা। এ মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির শাসন ব্যবস্থা দ্বারা জনগণের কোনো কল্যাণই সাধিত হতে পারে না। তাই তা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা একটি নিরেট মিথ্যা তথা 'কুফর'কে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ চেষ্টাকে কোনোক্রমেই 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলা যেতে পারে না। কুরআনের ভাষায় তা হচ্ছে 'জিহাদ ফী সাবীলিত তাগুত'- তাগুতী শাসন কায়েমের সংগ্রাম।

এ পর্যন্ত তাত্ত্বিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলো। কিন্তু বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখলে বিষয়টি অধিকতর বীভৎস হয়ে দেখা দেবে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন কীভাবে হয়?

তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলে এক-একটি রাজনৈতিক দল, দলের সদস্য বা কর্মীদের মধ্য থেকে কিছু লোককে টিকেট (মনোনয়ন) দিয়ে প্রার্থীরূপে দাঁড় করায়। অতঃপর সে প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালানো হয়। জয়লাভের জন্য প্রার্থী নিজেও ভোটদাতাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট ভিক্ষা চায়।

রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত 'সেকিউলার বা ধর্মদ্রোহী' রাজনীতি করে। সেকিউলার ব্যক্তিরাই তার নেতা, উপনেতা ও কর্মী হয়। তাই প্রার্থী নির্বাচনে আদর্শবাদ ও নৈতিকতার প্রশ্নটি সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়। ফলে সাধারণত নৈতিকতার মানে উত্তীর্ণ কোনো ব্যক্তিই প্রার্থী হয় না। প্রার্থী হয় তারা যাদের অঢেল টাকা আছে; যাদের দাপট ও কর্তৃত্ব করার-ভোট আদায় করার ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি; যারা জনগণের নিকট 'আকাশের চাঁদ হাতে তুলে দেয়া'র মিথ্যা ওয়াদা করতে সক্ষম।

এসব নির্বাচনে ব্যক্তির পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। অসংখ্য কর্মীকে ক্যানভাসার নিয়োগ করা হয়। তারা যে-কোনোভাবে ও যে কোনো কথা বলে ভোট আদায়ের চেষ্টা চালায়। ভোটদাতাদের ভোটকেন্দ্রে আনতে হয় এবং ফেরত পৌঁছিয়ে দিতে হয়। পান-বিড়ি-সিগারেট ও চা-বিস্কুট থেকে শুরু করে বিরিয়ানী পর্যন্ত খাওয়ানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। আর প্রায় সব নির্বাচনেই জাল ভোটের স্রোতে প্রকৃত ভোটের সুফল রসাতলে যায়।

এভাবে নির্বাচনে এক-একজন প্রার্থীকে যে কত রাশি রাশি টাকা ব্যয় করতে হয়, তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। বস্তুত যে প্রার্থীর জন্য এই অপরিমেয় বেহিসাবী টাকা ব্যয় করা হবে, সে-ই নির্বাচিত হওয়ার আশা করতে পারে। যে পারে না বা যার জন্য সেরূপ বেহিসাবী টাকা ব্যয় করা হয় না, সাধারণত তার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। এরূপ নির্বাচনে ইসলামী দলের প্রার্থীকেও অনুরূপ কার্যকলাপ চালাতে হয়; না চালিয়ে কোনো উপায় থাকে না। উপরন্তু তাদেরকে মুখে এ

ঘোষণাও দিতে হয় যে, আমাদের ভোট দিলে আমরা ইসলামী হুকুমাত কায়েম করব। অথচ কার্যত তাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হয় না; বরং অনৈসলামী সংবিধানের ভিত্তিতে প্রচলিত নিয়মে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তারাও নিজেদেরকে সেকিউলার বানিয়ে নেয় এবং পরিণামে 'ইসলামী' হওয়ার সব বিশেষত্বই হারাতে বাধ্য হয়।

এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়ার পর এক-একজন সংসদ সদস্যের প্রধান লক্ষ্যই থাকে, কী করে ব্যয়িত অর্থ ফেরত পাওয়া যেতে পারে। তদুপরি অনুরূপ পরিমাণ অর্থ পরবর্তী নির্বাচনেও ব্যয় করার সামর্থ্য অর্জনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তাকে তৎপর হতে হয়।

এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত বা বিজয়ী ব্যক্তি কখনো সর্বমোট ভোট দাতাদের অধিকাংশের প্রতিনিধি হতে পারে না। অনেকে মোট প্রদত্ত ভোটেরও এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে হয় কম সংখ্যক ভোটারের প্রতিনিধি, অধিক সংখ্যকের নয়।৩

এই 'কম সংখ্যক' ভোটারের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিরাই সংসদে গিয়ে জাতীয় জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ভোটদানের অধিকারী হয়ে থাকে। ফলে তারা কোনো একটি সমস্যারও সমাধান করতে সক্ষম হয় না, বরং তাদের একদেশদর্শী চিন্তা, বিবেচনা ও অপরিণত-অনবহিত জ্ঞানের ভিত্তিতে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যে সব আইন পাস করা হয়, তা জাতীয় জীবনে অসংখ্য দুঃসমাধ্য সমস্যারই সৃষ্টি করে থাকে। তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান বা আইন পাস করার সময় তারা ভোটদাতা জনগণের নয়, নিজেদেরই প্রতিনিধিত্ব করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনমতের কোনো তোয়াক্কাই তারা করে না।

ফলে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা অসহায় জনগণের উপর জগদ্দল পাথর হয়েই চেপে বসে। নিরীহ জনগণকে শোষণ-লুণ্ঠন ও নিষ্পেষণ করাই হয় তার একমাত্র কাজ।

এহেন গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ জনদরদের কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করে। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে, তারা জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে তুলে দেয়ার জন্য সংগ্রাম করছে। অথচ জনগণের ভোটে তারাই হয়

ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক। জনগণ সে ক্ষমতার এক কড়া-ক্রান্তিও অংশ পায় না। এ ব্যাপারে নেতা-নেত্রীদের মুখরোচক বুলি পরিষ্কার ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বলা যায়, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাত থেকে ভোটের প্রহসনের মাধ্যমে কেড়ে নিয়ে নেতাদেরই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার তন্ত্র মাত্র। এ কথায় সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

মানুষ কি মানুষের গোলাম হবে?

গণতান্ত্রিক নিয়মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে একজন ভোটদাতা কারোর পক্ষে যখন ভোট প্রয়োগ করে, তখন তার এ ভোটদানের মাধ্যমে স্বতঃই এবং নিঃশব্দে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, "আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছেমত যে কোনো আইন পাস করার ক্ষমতা দিচ্ছি এবং ওয়াদা করছি যে, তুমি অন্যদের সাথে মিলিত হয়ে যে আইন পাস করবে, তা আমি নির্দ্বিধায় মেনে নেব।"

কুরআনের দৃষ্টিতে আইন রচনার এরূপ নিরংকুশ ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া সুস্পষ্ট শিরক। কেননা, এর ফলে মানুষ মানুষেরই গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহর বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

এভাবে যারাই মানুষকে নিজেদের গোলাম বানাতে চায়, কুরআনের দৃষ্টিতে তারা মানুষের রব্ব (প্রভু) হতে চায়, যেমন করে নমরূদ ও ফিরাউন মানুষের রব্ব হতে চেয়েছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) নমরূদের রব্ব হওয়ার এবং হযরত মূসা (আ.) ফিরাউনের রব্ব হওয়ার দাবি অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে একমাত্র আল্লাহকে রব্বরূপে মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আহ্বানও ছিল সর্বতোভাবে তা-ই। পরিণামে নমরূদ ও ফিরাউন পর্যুদস্ত হয়েই প্রমাণ করে গেছে যে, তারা কেউই প্রকৃত সার্বভৌম নয়।

অতএব, আজকের মানুষের সামনে এ প্রশ্ন সুতীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে- তারা কি নিজেরা ভোট দিয়ে নিজেদের মতো মানুষকেই রব্ব বানাতে

এবং তাদের দাসানুদাস হয়ে জীবন যাপন করতে প্রস্তুত? না মানুষের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্দী হওয়ার গণতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে মানুষের রব্ব হওয়ার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে, এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, এক আল্লাহর বান্দা হয়ে জীবন যাপন করতে চান?

যদি তারা বাস্তবিকই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই কালেমার প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকেন, তাহলে প্রথমোক্ত পথ তাদের নয়। তাদের জন্য গ্রহণীয় পথ মাত্র একটিই এবং তা হচ্ছে শেষোক্ত পথ।

মানুষ আল্লাহর বান্দাহ, আল্লাহর খলীফা

বস্তুত মানুষ কখনও মানুষের গোলাম হতে পারে না; কোনো মানুষ পারে না মানুষের রব্ব হতে। মানুষ কেবল আল্লাহরই বান্দাহ হতে পারে। তাই মানুষকে রব্ব বানানোর তথাকথিত গণতন্ত্র কখনই গ্রহণযোগ্য নয়; তা সর্বতোভাবে পরিহার্য। অন্যদিকে প্রথমে মানুষকে রব্ব বানিয়ে মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে পরে আল্লাহকে রব্ব বানানোর– আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার কথাও কোনো ঈমানদার ব্যক্তিই বলতে পারে না, মেনে নিতে পারে না কোনো মুসলমান।

অতএব যারা মনে করে, 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে' কিংবা যারা 'প্রথমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে তারপর ইসলামী হুকুমাত' কায়েম করার কথা বলে, তারা যেমন 'গণতন্ত্র' চেনে না, তেমনি জানে না ইসলামের তওহীদী আকীদার তাৎপর্য। তারা বিভ্রান্ত। রাসূলে করীম (স.) কুরাইশ সরদারদের নেতৃত্ব সাময়িকভাবে মেনে নিলেও 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র সব দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-হিজরাত থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পেতে পারতেন। সে পথ গ্রহণের কত প্রস্তাব– কত প্রলোভনই না তার সমীপে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তওহীদী আকীদায় বলীয়ান হয়ে এবং ও পথে ইসলাম কায়েম হতে পারে না এটা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরে সে সব প্রস্তাব-প্রলোভনকে ঘৃণাভরে দু'পায়ে দলে গেছেন। তিনি প্রতি মুহূর্তে–প্রতিটি দিন

নির্যাতন–নিষ্পেষণের পথে পা বাড়িয়েছেন, কিন্তু শিরক–এর কুসুমাস্তীর্ণ পথে পা বাড়ান নি। তিনি ভুলেও কখনও এ মত গ্রহণ করেন নি যে, 'ইসলাম মানুষের মন জয় করা ছাড়া কিছুতেই চালু করা সম্ভব নয়' বা 'মানুষের মন জয় করেই ইসলাম কায়েম করতে হয়।' কুরাইশ সরদারের দাবি ও প্রস্তাব মেনে নিলেই নবী করীম (স.) তাদের মন জয় করতে পারতেন; কিন্তু তা তিনি প্রত্যাখ্যান করে তাদের মন জয় না করেই সোজাসুজি ও সরাসরিভাবে জনগণের সামনে ইসলামে বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করতে থাকলেন। অতএব, আগে গণতন্ত্র তার পরে ইসলাম' কথাটি নবী করীম (স.)-এর সুন্নাত ও কর্মনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ও কর্মনীতি

আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে, নবী-রাসূলগণ কখনও গণতন্ত্র কায়েমের দাওয়াত দেননি। তাঁরা প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার- আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার দাওয়াত দিয়েছেন এবং তা-ই হচ্ছে ইসলাম ও ইসলামী হুকুমাত কায়েমের একমাত্র পথ ও পন্থা। এ পথ ও পন্থা চিরন্তন। সর্বকালের সর্বদেশের সকল অবস্থায় এ দাওয়াতই হচ্ছে আল্লাহর বান্দাগণের একমাত্র দাওয়াত। একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল পন্থা। কেননা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানের অধিকারীরাও এটা বোঝে যে, ইসলামের বিরুদ্ধতার দিক দিয়ে সামরিক শাসন ও গণতান্ত্রিক সরকার– এ দুয়ের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্যই নেই। দু'টিরই মূলকথা মানবীয় সার্বভৌমত্ব। আর ইসলামের মূলকথা হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। মানবীয় সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক রূপ যা-ই হোক কোনো দিনই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা ইসলাম কায়েমের পথ খুলে দেয়নি। কেননা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম হলে মানবীয় সার্বভৌমত্বের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, তাতে তার অপমৃত্যু ঘটবে। আর কোনো ব্যক্তি বা কোনো শক্তিই সহজে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত হয় না।

তাই যারা মনে করে, সামরিক শাসনে দ্বীন ইসলাম কায়েমের আহ্বান দেয়া যায় না, গণতন্ত্র কায়েম হলে খুব সহজেই দেয়া যাবে– কোনো বাধা থাকবে না, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করে। তারা এ-ও বোঝে না যে, সামরিক শাসন এক ব্যক্তির শাসন, তার বিরুদ্ধে জনমনে থাকে ব্যাপক ঘৃণা, ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি। এ সময়ই জনগণের সম্মুখে মানবীয় সার্বভৌমত্বের দোষ-ত্রুটি ও অনিষ্টকারিতা স্পষ্ট করে দেখানো অতি সহজ। গণতান্ত্রিক সরকার যেহেতু জনগণের ভোট ও সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার পিছনে জনগণের অন্ধ সমর্থন থাকা স্বাভাবিক। তদুপরি সরকারি দল থাকে সারাদেশে ছড়িয়ে। তারা তাদের 'ম্যানিফেস্টো' অনুযায়ী কাজ করে অতি সহজেই জনগণকে বোঝাতে ও শান্ত করতে পারে, তার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনতে জনগণ সহজে রাযী না-ও হতে পারে। তাছাড়া ইসলামের দাওয়াত দিলে সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামী হুকুমাত কায়েম হয়ে যাবে, এমন কোনো কথা নেই। এ এক দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম। সরকার সামরিক না গণতান্ত্রিক, ইসলামী হুকুমাত কায়েমের সংগ্রামের দৃষ্টিতে তা একবারেই অবাস্তব। তাই আজকের ইস্যুই হচ্ছে মানুষ আল্লাহর গোলাম হবে না মানুষের? দেশে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হবে, না কি হবে কুফরী হুকুমাত; দেশে ইসলাম থাকবে কি থাকবে না? কেননা তথাকথিত ধর্মহীন গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হলে তা ইসলাম কায়েমের পথে তেমনি দুর্লংঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে, যেমন বর্তমানে[৪] সামরিক শাসন দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়া বর্তমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে যারা জয়ী হবে, যারা সরকার গঠন করবে, তারা আর যা-ই হোক ইসলামী সরকার গঠন করবে না, করবে সেকিউলার বা ধর্মহীন সরকার। সে ধর্মহীন সরকার পূর্ণ শক্তি দিয়ে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের পথ বন্ধ করে দেবে, এটাই স্বাভাবিক। '৭২-এর সংবিধান গণতন্ত্রবাদীদের দ্বারাই রচিত হয়েছিল এবং তারাই সংবিধানের ৩৮ ধারায় লিখে দিয়েছিল, ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন করা যাবে না। ফলে '৭৬ সন পর্যন্ত এদেশে কোনো ইসলামী দল গঠিত হতে পারেনি। তা ছিল সম্পূর্ণ বেআইনী। কাজেই যাদের লক্ষ্য ইসলামী হুকুমাত কায়েম করা, তাদের নিকট বর্তমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি এক বিন্দু আকর্ষণ থাকতে পারে না।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই সঠিক

তাই দেশের মুমিন-মুসলিমদেরকে গণতন্ত্র নয়, ইসলামী হুকুমাত তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য অনতিবিলম্বে সংগ্রাম শুরু করতে হবে। এই সংগ্রামকারীদের বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে, গণতন্ত্র বা কোনো তন্ত্র-মন্ত্র নয়, একমাত্র ইসলামী হুকুমাত তথা খিলাফত কায়েমই হলো মুক্তির পথ। এ ছাড়া বর্তমান সমস্যাবলির কোনো সমাধানই হতে পারে না।

খিলাফত কুরআন মজীদেরই একটি পরিভাষা। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে তাঁর বান্দাহ হিসাবে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ মানুষকে যে সব মহৎ গুণের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন, তাতে মানুষ কখনই, কোনো অবস্থায়ই আল্লাহ– (সার্বভৌম বা রব্ব) হতে পারে না, পারে না আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি) হতে, খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে। তাই মানবীয় সার্বভৌমত্বভিত্তিক 'গণতন্ত্র' যেমন মানুষের জন্য একটি ধোঁকা-একটি বিরাট প্রতারণা, তেমনি তা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃতি ও মানবীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি ঈমান পোষণেরও মতবাদ। এ মতবাদের শ্লোগান দিয়ে দিয়ে এত দিন পর্যন্ত মানুষের প্রভু বা রব্ব-নিরংকুশ শাসক হতে ইচ্ছুক রাজনৈতিক নেতারা জনগণকে মারাত্মক ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছে। এই ধোঁকা থেকে মুক্তিলাভ না করা ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত কোনো মু'মিন-মুসলিমই ঈমানী দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিপ্লবেরই প্রচেষ্টা। এ বিপ্লবের পরিণতিতেই সম্ভব বর্তমান প্রশাসন কাঠামোকে-যা গোলামীর প্রতীক, যা ইসলাম কায়েমের প্রধান প্রতিবন্ধক- উৎখাত করে খিলাফতে রাশেদার আদর্শ প্রশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। শুধুমাত্র ক্ষমতার হাত-বদলই এর লক্ষ্য নয় বস্তুত খিলাফত প্রতিষ্ঠা তথাকথিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাই সম্ভব। গণতান্ত্রিক সরকার এ ভূখণ্ডে একাধিকবার গঠিত হয়েছে; কিন্তু গণতন্ত্র মুদ্রার অপর পিঠে যেহেতু স্বৈরতন্ত্র মুদ্রিত, তাই গণতান্ত্রিক সরকারকে মাত্র তেরো মিনিটের

মধ্যেই স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে এবং তার হাতে জনগণের যাবতীয় মৌলিক অধিকার অপহৃত হতে দেখা গেছে প্রত্যক্ষভাবে।

মুলতবী সংবিধানকে[৫] বহুদলীয় প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে বড় গলায় দাবি করা হয় এবং তাকে পুনর্বহাল করে তারই ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও দাবি জানানো হচ্ছে জোরে-শোরে। সামরিক সরকার প্রধান (এরশাদ)ও সেই মুলতবী সংবিধান বহাল করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি তো দেবেনই। কেননা, জনগণের রব্ব বা খোদা হয়ে বসার জন্য মুলতুবি সংবিধান একটি মোক্ষম হাতিয়ার। তাতে প্রেসিডেন্টকে এত নিরংকুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কুরআন অনুযায়ী যা একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।[৬] ইসলামী দৃষ্টিকোণ দিয়ে সে সংবিধান পাঠ করলেই তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তাই মুলতুবি সংবিধান হচ্ছে প্রেসিডেন্টকে– অথবা একজন সাধারণ মানুষকে রব্ব বা খোদার আসনে বসানোর সংবিধান। কোনো ঈমানদার ব্যক্তিই কি কোনো মানুষকে খোদার আসনে বসাতে রাজি হতে পারে?

তাই মুলতুবি সংবিধান বহাল করা হলে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নিজেদের হাতেই চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হবে। এ কারণেই খিলাফত কায়েমের লক্ষ্যে গঠিত ইসলামী দলসমূহের সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ[৭] মুলতুবি সংবিধান বহাল করার সুস্পষ্ট বিরোধী। তার পরিবর্তে ইসলামী জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত বিপ্লবী সরকারের নেতৃত্বে ঈমানদার বুদ্ধিজীবী ও হক্কানী আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির দ্বারা নতুন করে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী সংবিধান রচনার কার্যসূচি গ্রহণ করেছে।

বস্তুত পুরাতনকে মেরামত করে, জোড়াতালি দিয়ে দুর্নীতি ও কুসংস্কারের জঞ্জালে নিমজ্জিত বর্তমান মুসলিম সমাজকে ইসলামী বানানো সম্ভব নয়। পূর্ণাঙ্গ ইসলামের বাস্তবায়ন সম্ভব একটি ইসলামী বিপ্লবের দ্বারা; সে বিপ্লবই হওয়া উচিত মুসলমানদের একমাত্র লক্ষ্য।

এ দাওয়াত কবুল করে সম্মিলিতভাবে খিলাফত কায়েমের জিহাদে জান-মাল দিয়ে শরীক হওয়ার আহ্বান জানাই।

(১৯৮৫ সালের প্রথম ভাগে ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের এক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের লিখিত রূপ)

টীকা

১. অধুনা কিছু কিছু চতুর বুদ্ধিজীবী 'সেকিউলার' শব্দটির তর্জমা করতে চান ইহজাগতিকতা-ধর্মহীনতা নয়। অথচ চেম্বার, অক্সফোর্ড প্রভৃতি অভিধানে সেকিউলার বলতে ধর্মবর্জিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে।

২. ১৯৯১-এর নির্বাচন পরবর্তী খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব এবং ১৯৯৬-এর নির্বাচন-পরবর্তী শেখ হাসিনার নেতৃত্বকেও এ থেকে পৃথক করা চলে না। কারণ ঐ দুই নির্বাচনের পর দেশে ঐ দুই ব্যক্তিরই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. সাম্প্রতিককালে নির্বাচন এমন একটি তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছে যে, এখন আর সব ভোটকেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতিরও প্রয়োজন হয় না। ভোটারের উপস্থিতি ছাড়াই ব্যালট বাক্স পূর্ণ হয়ে যায়। ১৯৮৬ ও ১৯৮৮-এর নির্বাচন এরই অকাট্য প্রমাণ।

৪. মনে রাখতে হবে কথাটি বলা হয়েছিল আশির দশকের প্রথম ভাগে দেশে সামরিক শাসন চলাকালে। কথাটির প্রেক্ষাপট পাল্টে গেলেও এর মূল আবেদন এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে।

৫. এ কথাটিরও প্রেক্ষাপট আশির দশকের সামরিক শাসন চলাকালীন পরিস্থিতি। ১৯৯১ সালের নির্বাচিত পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিকে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেছে মাত্র।

৬. সংবিধান সংশোধনের পর বর্তমানে এ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ভোগ করছেন।

৭. এ পরিষদ গঠিত হয়েছিল আশির দশকের গোড়ার দিকে হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে। পরে হাফেজ্জী হুজুরের নিজস্ব দলটি '৮৬-এর নির্বাচনে অংশ নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তদবধি ইসলামী ঐক্য আন্দোলন ঐ একই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। – সম্পাদক

বাণী চিরন্তন

এদেশের মুসলিম জনতা শুধু মানচিত্র বদলই নয়, ইংরেজ আমলের যাবতীয় অভিশাপ থেকে মুক্তি চায়।

আজকের বাস্তব অবস্থা দেখে মনে হয় এদেশটি স্বাধীন হলেও স্বাধীন নয়– নিতান্তই গোলাম দেশ, পরাধীন জীবন।

পাশ্চাত্যের এ গণতন্ত্রের সার কথা হল জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং তাদের উপর নির্বাচিত লোকদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব।

মানুষ কখনও মানুষের গোলাম হতে পারে না। কোন মানুষ পারে না মানুষের রব হতে। মানুষ কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র বান্দা হতে পারে।

–গণতন্ত্র নয় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব

এদেশের বিপুল সংখ্যক আলিম রূপে পরিচিত ব্যক্তি বার বার জালিম তাগুতী শাসকের হাতে বিক্রি হয়ে ঈমানী তাকীদের কথা ভুলে গেছেন, ভুলে গেছেন তাদের মহান মর্যাদার কথাও। হারিয়ে ফেলেছেন তাদের সম্মানটুকু।

–ইসলামী সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা

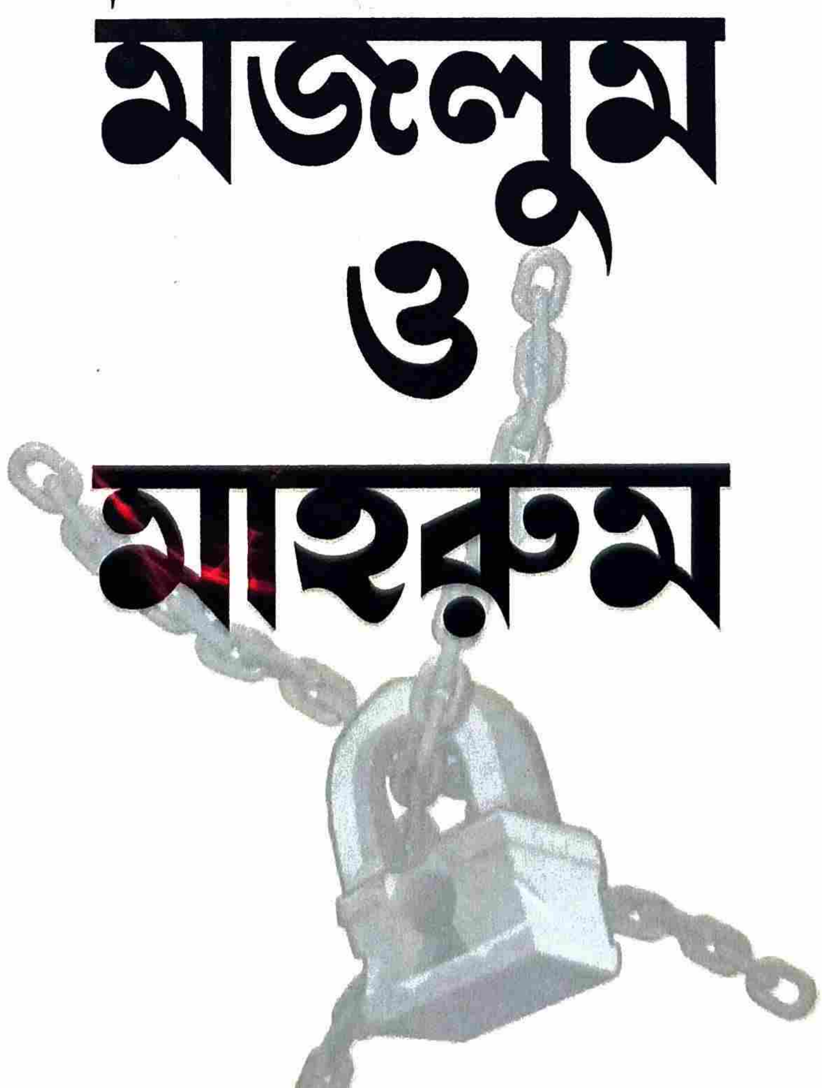
ইসলাম সম্পর্কে একথা চূড়ান্ত যে, তা সামগ্রিক জীবনের জন্য এক পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী আদর্শ, এক বিশ্বজনীন পুনর্গঠন প্রচেষ্টা, এক সর্বাত্মক সংগ্রামের নাম, তা একটি চিরন্তন ও শাশ্বত জীবন বিধান– একটি আপোষহীন সংগ্রাম।

–শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

খায়রুন প্রকাশনী

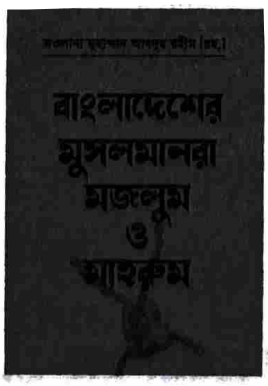
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম [রহ.]

বাংলাদেশের মুসলমানরা মজলুম ও মাহরুম



বাংলাদেশের মুসলমানরা মজলুম ও মাহরুম

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.)



প্রকাশনায়
ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

বাংলাদেশের মুসলমানরা মজলুম ও মাহরুম

আজকের এই বিরাট সমাবেশে উপস্থিত সুধীবৃন্দের নিকট অর্থাৎ আপনাদের নিকট যে কথাগুলো আমি রাখতে চাই, সে কথাগুলোর মূল শিরোনাম বলা যেতে পারে আত্ম-পর্যালোচনা। আমি মনে করি, প্রত্যেক জাতিরী প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সচেতন, যারা চিন্তাশীল তাদের এটা কর্তব্য যে, তারা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকবেন এবং নিজেদের অবস্থান কোথায় তা পর্যালোচনা করে তারই আলোকে জাতীয় পর্যায়ে একটা দিক-নির্দেশনা খুঁজে বের করতে উদ্যোগী হবেন।

মনে রাখবেন, এটা একান্তভাবে জরুরি; কেননা যে জাতি আত্ম-সমালোচনা করতে পারে না, নিজের অবস্থার পর্যালোচনা করতে পারে না বা করে না সে জাতি দুনিয়ার বুকে কোনো দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। সে জাতি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যায়, যেমন তেলহীন প্রদীপ নিভে যায় ক্রমশ। কারণ প্রদীপে তেল দিয়ে জ্বালিয়ে রাখার জন্য কেউ যদি না-ই থাকে তবে প্রদীপ তো নিভে যাবেই।

আমরা বাংলাদেশী নাগরিক। এদেশ সম্পর্কে, আমাদের নিজেদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করা, চিন্তা-ভাবনা করা এবং এর সব কিছু নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সকলেরই উচিত বলে আমি মনে করি। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম আমি একটি বাক্য উচ্চারণ করতে চাই, আর তা হচ্ছে– বাংলাদেশের মুসলমানরা আজ মজলুম ও মাহরুম। মজলুম মানে আমরা জুলুমের শিকার– আমাদের ওপর চালানো হচ্ছে অহর্নিশ জুলুম। আর মাহারুম মানে আমরা বঞ্চিত। বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে আমাদের অধিকার থেকে। অর্থাৎ আমাদের যা প্রাপ্য তা আমাদের দেয়া হচ্ছে না।

আমরা যে মজলুম এবং মাহরুম সাধারণভাবে বলতে গেলে সে চেতনাটুকুও যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের ওপর নানাভাবে নানা দিক দিয়ে যে নিপীড়ন চলছে, অত্যাচার চলছে, নির্যাতন চলছে এবং আমাদেরকে যে আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেয়া হচ্ছে না, বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে আমাদের অধিকার থেকে, এ কথাটি পর্যন্ত আমরা (আমাদের সমাজের লোকেরা) বুঝতে পারছি না। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো চেতনাই নেই। চেতনা যদি থাকতো তবে আমরা জাতীয় জীবনে তার অনেক প্রতিক্রিয়া দেখতে পেতাম। দেখা যেত অনেক বলিষ্ঠ আন্দোলন, অনেক চেষ্টা-সাধনা এবং অনেক সংগ্রাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ইদানীং বাংলাদেশের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যেন এটা মৃত জনপদে পরিণত হয়েছে। সত্যিকার অর্থে নিজ অস্তিত্বে টিকে থাকার মতো কোনো বলিষ্ঠ উদ্যোগ, কোনো চিন্তা-ভাবনাও আমাদের মাঝে নেই। কচুরিপানার মতো পানিতে ভেসে চলছি– কখনও জোয়ারের টানে সামনের দিকে যাই আবার কখনো ভাটার টানে নিচে নেমে যাই। রাষ্ট্রীয় নেতারা যে দিকে খুশি আমাদেরকে চালিয়ে নিয়ে যায়, আমরাও সেভাবেই চলতে থাকি। কখনো সামনে কখনো পিছনে। কোনো চেতনাহীন জাতিকে নিয়েই মানুষ হয়তো এভাবে খেল-তামাশা করতে পারে।

জাতির এ ক্রান্তিকালে, আমাদের যে কিছু চিন্তা-ভাবনা করার আছে– আছে কিছু দায়িত্ব, সে কথাটিও কি আমরা ভুলে যাবো? এ দেশের নাগরিক হিসেবে, সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক; তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায়ই আমাদের নেই। এ কথা সকলকে মনে রাখতে হবে।

আমি যে বলছি, বর্তমান সময়ে আমরা মজলুম, এর অর্থ– নানাভাবে আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় যে জুলুম করা হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে, যা অত্যন্ত সাংঘাতিক এবং অত্যন্ত মারাত্মক, তা হচ্ছে– আমাদের জাতীয় জীবনে কোনো আদর্শ, কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। কিসের ওপর ভিত্তি করে এ জাতি চলবে, কোন আদর্শের অনুসারী হবে, তা কেউ বলতে পারছে না। কাজেই এ ব্যাপারে আমাদেরকে আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। যা আমাদের প্রাপ্য, যা আমাদের হক, যা ছাড়া কোনো জাতি চলতে পারে না, পরিচিতি লাভ করতে পারে না– তা আমাদের কেউ দিচ্ছে না।

প্রতিটি জনগোষ্ঠীর, প্রতিটি জাতির একটি নিজস্ব আদর্শ থাকে। জাতির জনগণ সে আদর্শ দ্বারা লালিত পালিত হয়। দেশ তথা রাষ্ট্র-সরকার-সমাজ সব কিছুই সে আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়। দেশে যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে– নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত– সব কিছু তারই আলোকে, তারই আদর্শে গড়ে ওঠে, আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজকে যদি আমাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করে আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশী জনগণের জাতীয় আদর্শ কী? তবে তার কোনো জবাব দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনারা যারা এখানে সুধী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা রয়েছেন, আপনারা কেউ কি বলতে পারবেন আমাদের জাতীয় আদর্শ কী? বলতে পারবেন না, কারণ সে সম্পর্কে আমাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণাই নেই। কেউ কেউ বলে আমরা মুসলমান, কেউ বলে আমরা বাঙালি আবার কেউ বলে আমরা বাংলাদেশী। আসলে আমরা যে কী, জাতীয়ভাবে তার কোনো ফায়সালা করা হয় নি। তাই এর জবাবও আমরা সত্যিকার অর্থে দিতে পারছি না। আমাদের পরিচিতি নিয়ে, জাতীয় আদর্শ নিয়ে চলছে এক গভীর চক্রান্ত– এটা বুঝার মতো বিবেক-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আমরা নির্বিকারভাবে বসে আছি; কিন্তু কেন?

দেশে যখন কিছুটা মুসলিম চেতনাসম্পন্ন লোকেরা ক্ষমতায় আসে তখন আমাদের ধারণা দেয়া হয় জাতি হিসেবে আমরা মুসলমান। আবার যখন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা হয় বাঙালি– বাঙালি চেতনার ধারক-বাহক, তখন জাতি হিসেবে আমাদের পরিচিত করানো হয় বাঙালি। আবার যখন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তি ক্ষমতায় আসন গ্রহণ করে তখন আমাদের পরিচিত করানো হয় বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদী জাতি হিসেবে। অর্থাৎ ক্ষমতাসীনরা

যখন যে চিন্তার অনুসারী হয়, জনগণকে তখন সে হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করানোর চেষ্টা করা হয়। এ এক আজব দেশ! দেশের জনগণকে নিয়ে এভাবে এক আজব খেলা শুরু হয়েছে।

যা হোক মুসলিম নামধারী সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক হিসেবে আমরা অবশ্যই বলব, আমরা জাতি হিসেবে মুসলমান। আর এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, এখানকার লোকেরা মুসলমান বলেই ১৯৪৭ সনে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তিকালে আমরা ভোট দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলাম এবং জাতি হিসেবে পরিচিত ছিলাম মুসলমান হিসেবে।

বর্তমানে আমরা মনে করি এবং দাবিও করা হয় যে, আমরা একটি স্বাধীন জাতি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমরা কতটা স্বাধীন? স্বাধীন বলা হয় কাকে? প্রচলিত নিয়মে স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দেয়া হয় তাতে বলা হয়– যদি কোনো বিদেশী জাতি বা শক্তি দ্বারা কোনো দেশ শাসিত না হয় তবে সে স্বাধীন। আর যদি তার উল্টোটা হয় অর্থাৎ কোনো বিদেশী শক্তি দ্বারা কোনো দেশ যদি শাসিত হতে থাকে তখন সে হয় পরাধীন। এটুকু নিয়ম বা দর্শনের ভিত্তিতে স্বাধীনতার অর্থ করা হয়। কিন্তু আমার কাছে স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে– প্রতিটি জাতির নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও ঈমান-আকীদা মোতাবেক জীবন যাপন করার অধিকার পাওয়া। নিজেদের ঈমান-আকীদা অনুযায়ী যদি জনগণ জীবন যাপন করার অধিকার পায়– পায় সুযোগ-সুবিধা তবে তারা স্বাধীন। আর যদি তা না থাকে তাহলে তারা পরাধীন; এক কথায় মজলুম ও মাহরূম।

এ ইতিহাস সকলেরই জানা যে, প্রায় দুশো বছর ধরে আমরা এ অঞ্চলের মানুষ বৃটিশদের গোলাম ছিলাম। ইংরেজরা এ দেশ দখল করে নিয়েছিল আর মুসলমানদের হাত থেকে নিয়েছিল ক্ষমতা কেড়ে। তার পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু এদেশের প্রশাসনিক কাঠামো, এ দেশের আইন-কানুন, এদেশের বিচার-আচার, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব কিছুই মৌলিকভাবে ইসলামী আদর্শের অনুসারী ছিল। বিকৃতি যে ছিল না এমনটি বলা যাবে না; তবে মৌলিকভাবে সব জিনিসই ইসলাম অনুযায়ী ছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ইংরেজরা যখন এ দেশ দখল করে নিলো তারপর থেকে তারা একে একে সব কিছুই বাতিল করতে শুরু করে দিল। মুসলমানদের গড়া নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন, সভ্যতা-সাংস্কৃতি, এক কথায় যাবতীয় সিস্টেম একেবারে

পাল্টে ফেলল। নাম-চিহ্ন মুছে দিতে লাগলো মুসলিম জাতীয় আদর্শের। আর তার জায়গায় তারা নিজেদের মনগড়া সব সিস্টেম, রীতি-নীতি, শিক্ষাদর্শ চালু করে দিল।

এ দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে ছিল মাদ্রাসা শিক্ষা। সেখানে যে দ্বীনি শিক্ষা দেয়া হতো তারই আলোকে শিক্ষিত হয়ে এদেশের লোকেরা রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম পর্যন্ত আঞ্জাম দিত। কিন্তু ইংরেজরা এসে সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বাতিল করে দিয়ে তদস্থলে নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করল। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ, ইউনিভার্সিটি সর্বত্রই নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও কৃষ্টি সভ্যতাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে দিল। তার ফলে এ শিক্ষাব্যবস্থাই এদেশের জাতীয় শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করল। দীর্ঘ দুশো বছর আমাদের ছেলে-মেয়ে, আমাদের বংশধর অর্থাৎ এদেশের মুসলমান ঘরের লোকেরা ইংরেজদের গড়া ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করতে লাগল। ফলে মুসলমানদের নিজস্ব যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তার মান ও গুরুত্ব দুটোই হারিয়ে যেতে লাগল।

মুসলমানরা দ্বীনি মাদ্রাসা চালাতে থাকল বটে, কিন্তু জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সে শিক্ষার কোনো গুরুত্ব আর রইল না। অন্যদিকে ইংরেজরা যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরাই একে একে চাকরিতে সুযোগ পেল, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পেল। এছাড়া যারা ইংরেজদের মনগড়া আইনশাস্ত্র নিয়ে লেখাপড়া করল তারাই দেশের বিচার ব্যবস্থার কর্ণধার হয়ে বসলো। ফলে দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব ক্রমে ক্রমে ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী লোকদের নিকট চলে গেল। শুধু তা-ই নয়, ইংরেজদের গড়া ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতো জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহযোগিতা দ্বারা আর মুসলমানদের যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলো চালু রাখা হয়েছিল কোনো রকমে গরীব মুসলমানদের দেয়া চাঁদার ওপর নির্ভর করে– খুবই অসহায় অবস্থায়। এ কারণে এ সকল প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত করুণ অবস্থার মধ্যে পড়ে থাকল। এভাবে মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির নাম-চিহ্ন যা কিছু ছিল একে একে তা মুছে যেতে লাগল আর ইংরেজদের গড়া নিয়ম-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছু প্রচারিত ও প্রসারিত হতে লাগল। এর পরিণতিতে আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের জীবনধারা বদলে যেতে শুরু করল। দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত সে শিক্ষাই

আমাদের জাতীয় শিক্ষা হিসেবে চলছে যা ইংরেজরা এদেশে কায়েম করে গিয়েছে।

আমি অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে এ কথা বলতে চাই এবং এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানরা মুসলমানিত্ব শিখতে পারে না, আল্লাহ্কে সঠিকভাবে চিনতে পারে না, আল্লাহর কালাম পড়তে পারে না, রাসূলে করীম (সা.)-এর হাদীস সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে না, বলতে গেলে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, সে শিক্ষাব্যবস্থাই আমাদের জাতীয় শিক্ষা হিসেবে চালু রয়েছে। এর চেয়ে বড় পরিতাপের বিষয় আর কী হতে পারে। আমি জানি না এ জন্যে কোনো ব্যথা, কোনো অনুশোচনা আমাদের অন্তরে অনুভূত হয় কি না। আমাদেরকে আমাদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মাহরুম করে রাখা হয়েছে– বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। আর অন্যদিকে আপনারা নিজেরাও দেখতে পাচ্ছেন যে, সেই ইংরেজদের চালু করে যাওয়া আইন-কানুনের ভিত্তিতেই দেশ ও জাতি আজও পরিচালিত হচ্ছে।

আমরা দাবি করি, আমরা স্বাধীন। ইংরেজরা (এবং পাকিস্তানিরা) এখন আর আমাদের দেশে নেই। সাত-সমুদ্দুর ওপার থেকে আসা সাদা চামড়ার লোকেরাও এখন আমাদের দেশ শাসন করছে না। কিন্তু তাদের গড়ে যাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা শিক্ষা লাভ করছে– তাদের চিন্তা-চেতনা ও চাল-চলন যারা রপ্ত করেছে তারা আজ ইংরেজদের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের ওপরে শাসনদণ্ড চালাচ্ছে। বলতে গেলে, সর্বত্রই ইংরেজদের গড়া নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন ও তাদের গড়া সিস্টেম চালু রয়েছে। অথচ এরপরও আমরা দাবি করি, আমরা স্বাধীন। একবার নয়, দু' দুবার এ দেশটি 'স্বাধীন' হয়েছে। কিন্তু আসল স্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীনতা বলতে যা বুঝায় আমার দৃষ্টিতে এখনও তা আমরা পাইনি, এদেশের মুসলিম জনগণ পায়নি।

আপনারা যদি প্রশ্ন করেন এর নিগূঢ় রহস্য কোথায়? তবে আমি বলবো যে, আমাদের মুসলমানদের ঈমান-আকীদা মোতাবেক দেশ শাসন করা হচ্ছে না; সে অনুযায়ী আমাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না, আমাদের সমাজ চলছে না, অর্থনীতি চলছে না, আইন-কানুন চলছে না, বিচার ব্যবস্থাও চলছে না। তাই সত্যিকার অর্থে আমরা স্বাধীন নই। বরং এখন পর্যন্ত সেই পরাধীনতার গোলামী শৃঙ্খলে আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি। আমাদের এ

পরাধীনতা ও এই গোলামীর শৃঙ্খল ভাঙতেই হবে। এর থেকে রেহাই আমাদের পেতেই হবে। মুসলমানদেরকে তাদের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত আজাদী ফিরিয়ে দিতে হবে; মুক্ত করতে হবে তাদের বিজাতীয় আদর্শের শৃঙ্খল থেকে।

আজ দেশে যে অবস্থা চলছে তা একটা স্বাধীন জাতির জন্যে অত্যন্ত লজ্জাজনক। কেননা দুনিয়ার ইতিহাস এটা প্রমাণ করে যে, বহু দেশ বিদেশি শাসক দ্বারা শাসিত হয়েছে। পরে যখন তারা সে দেশ ছেড়ে চলে গেছে তখন সে দেশের নাগরিকরা তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা এবং আদর্শ অনুযায়ী দেশ গড়ার কাজ শুরু করেছে ও পরাধীনতার পংকিলতা থেকে নিজদেরকে মুক্ত করেছে। কিন্তু আমাদের এখানে তা হয়নি। আমরা যে পঙ্কিলতার মধ্যে ছিলাম সেখানেই থেকে গেলাম; বরং পরাধীনতার সেই গ্লানি মোছার পরিবর্তে তাদের রেখে যাওয়া ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করে ধরে রাখলাম। আমাদের কৃষ্টি-সভ্যতা, আমাদের আদর্শকে যেভাবে ওরা ধ্বংস করেছে তাতে তো ইংরেজ বেনিয়াদের ওপর আমাদের ঘৃণা জন্মবারই কথা ছিল; কিন্তু তার পরিবর্তে ওদের রেখে যাওয়া খোদাদ্রোহী আদর্শকে গ্রহণ করে নিজেদেরকে আমরা গৌরবান্বিত মনে করছি, ধন্য মনে করছি; আমরা ভুলে গিয়েছি, আমরা মুসলমান।

তাই বলছি, স্বাধীন হয়েও সত্যিকারের স্বাধীনতা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। আমাদের প্রাপ্য অধিকার আমাদেরকে দেয়া হয়নি। আর যার যেটা পাওনা সেটা তাকে না দেয়াই হচ্ছে কুরআনের পরিভাষায় জুলুম। তাই বাংলাদেশের মুসলমানরা আজ মজলুম। তাদের যে মৌলিক অধিকার ছিল মুসলমান হিসেবে, তা তাদেরকে দেয়া হয়নি।

আমরা মুসলমান বলেই আমরা ঈমান রাখি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর। এ ঈমান অনুযায়ী আমাদের শাসন-প্রশাসন চালানো হবে; কিন্তু তা হচ্ছে না; এ ঈমান অনুযায়ী আমাদের জীবন গড়ে তোলা প্রয়োজন হলেও তা হচ্ছে না; বরং এর বিপরীত ঈমান ও আকীদা গড়ে তোলা হচ্ছে। এদেশে যত নিয়ম-নীতি চালু আছে সে সবের একটি একটি করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কোথাও আইনগতভাবে, নীতিগতভাবে বা আদর্শগতভাবে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি; সব কিছু ইংরেজদেরই রেখে যাওয়া। তাই আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই, আপনারাও একটু

মিলিয়ে দেখুন। বলতে গেলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পর্যায়, প্রতিটি কাজে আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে।

ইংরেজরা বিদেশি শাসক ছিল, আমরা ছিলাম ওদের গোলাম। তারা এখানকার বৈষয়িক উন্নয়নের জন্যে কিছু কিছু কাজ করেছে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন, তারা রাস্তা-ঘাট করেছে, রেল লাইন তৈরি করেছে, নগর-বন্দর-শহর ইত্যাদি নির্মাণ করেছে। এগুলো তারা করেছে এদেশের জনগণকে খুশি রেখে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ মজবুত করার জন্যে– শিকড় আরও শক্ত করে প্রোথিত করার জন্যে। তাদের লক্ষ্য ছিল, এদেশের মানুষকে চিরদিন যেন গোলাম বানিয়ে রাখা যায়, তাদের প্রতি আমরা যেন কৃতজ্ঞ থাকি। যাই হোক, এগুলো তো হচ্ছে অতীতের কথা; কিন্তু এখনও কেন তাদের প্রতি আমাদের অনুগৃহীত থাকতে হবে? তাদের রীতি-নীতি অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালিত করতে হবে? এর কী মানে থাকতে পারে? আমাদের কি এ থেকে মুক্তি পাওয়া বা নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় নেই? মুক্তির পথ কি আমরা খুঁজে পাব না?

আসলে মুক্তি পাবার জন্য মানুষের মনে যে আকুতি থাকা প্রয়োজন, উদ্বেগ থাকা প্রয়োজন, যে চিন্তা-ভাবনা থাকা প্রয়োজন তা হয়তো আমাদের মাঝে নেই। নইলে আজ ভিন্ন এক বিজাতীয় গোষ্ঠীর রেখে যাওয়া পন্থা-পদ্ধতিকে আমরা এতো আপন করে নেব কেন? আমাদের কেন বুঝে আসে না যে, ইংরেজরা যা কিছু এখানে করেছে তার মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার চেষ্টা করেছে। কিছু মানুষকে তারা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের নিকটবর্তী করে রেখেছে যেন তাদের মাধ্যমে এদেশের আম মুসলিম জনগণকে দাবিয়ে রাখা যায়; তারা যেন কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কার্যত হয়েছেও তাই। সে কারণে তখন থেকে এদেশের জনগণের কোনো মুক্তি আসেনি। জনগণ যে অন্ধকারে ছিল, যে দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল তা থেকে বের হয়ে আসা তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি।

দেখুন, ১৯৪৬ সনে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার জন্য এ অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। এদেশের মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিল, পাকিস্তান হলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। ১৯৪৭ সনে ইংরেজরা এদেশ থেকে চলে গেল। তারপর থেকে এদেশে বহুবার ভোটাভুটি হয়েছে; কিন্তু কী

পেয়েছে এদেশের মানুষ? ১৯৫৪ সনে সর্বপ্রথম ভোটাভুটি হয়েছে; তখন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ ক্ষমতায় ছিল। ইলেকশনে মুসলিম লীগ পরাজিত হলে যুক্তফ্রন্ট এসে দেশ শাসন করতে লাগল। কিন্তু দেশের সার্বিক অবস্থা একই রূপ থাকল; মৌলিক কোনো পরিবর্তন এলো না। তারপর ১৯৭০ সনে নির্বাচন হয়েছে।[১] বলা যেতে পারে, '৭০ সনের নির্বাচনের ফলেই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন কি হয়েছে? পাকিস্তান আমলে আমাদের যে অবস্থা ছিল বাংলাদেশ হবার পরও তা-ই অব্যাহত থাকল। এরপর ১৯৭৩ সনেও নির্বাচন হয়েছে। এ সকল নির্বাচন যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যায়, এর মাধ্যমে দেশে একদল শোষক শ্রেণি তৈরি হয় এবং কোনো-না-কোনোভাবে এদের হাতেই দেশের ক্ষমতা থেকে যায়। সরকার আসে, সরকার যায়; কিন্তু জনগণের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। মাঝে মধ্যে খুঁটিনাটি কিছু পরিবর্তন আসে; তবে মৌলিকভাবে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। এ মৌলিক পরিবর্তন না আসার কারণে এদেশের জনজীবনেও কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসে নি।

ইংরেজরা এদেশে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে গিয়েছিল। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলকথা হলো, দেশের মুষ্টিমেয় কিছু লোক বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদের মালিক হবে, বাকী লোকেরা থাকবে দরিদ্র। পাকিস্তান আমলের ২৩ বছর আমরা এ অর্থনীতিকে কাজ করতে দেখেছি। এখন বাংলাদেশ আমলেও আমরা সেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিকেই কাজ করতে দেখছি। সে আমলেও কিছুসংখ্যক লোকের নিকট বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ গচ্ছিত ছিল। তাদেরকে বলা হতো ২২ পরিবার। আদমজী, বাওয়ানী, দাউদসহ আরও অনেকে ছিল এই বাইশ পরিবারের মধ্যে শামিল। তারাই কোটি কোটি টাকার মালিক ছিল আর সাধারণ মানুষ ছিল সর্বহারা বা অতি অল্প বিত্তের মালিক। দেশের বেশিরভাগ টাকা-পয়সা অল্প কিছু লোকের নিকট পুঞ্জীভূত হয়ে গিয়েছিল।

আবার দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা দেখতে পেলাম, এক শ্রেণির মানুষ দেশের সম্পদ লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে। সরাসরি ব্যাংক ডাকাতি বা ব্যাংক থেকে ওভার ড্রাফট নিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা লুটে নেয়া হলো। কল-কারখানা একজনে দখল করে নিয়ে অন্যজনের কাছে তা বিক্রি করে দিয়ে তার অর্থ লুট করে নিল। শুধু তা-ই নয়, কল-কারখানায় যে বিপুল

পরিমাণ কাঁচামাল বা তৈরি পণ্য ছিল, গোডাউন ভেঙে তাও সব লুট করে নেয়া হলো। বিদেশি যা কিছু খাদ্য বা পণ্য সাহায্য আসছিল তার অধিকাংশই বিদেশি বাজারে বিক্রি হতে দেখা গেল। যার ফলে '৭৪-এ এখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং বহু মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে মারা গেল। সে সময়েও আমরা এ পুঁজিবাদী মনোবৃত্তিকে কাজ করতে দেখেছি। এক শ্রেণির মানুষ লুটে-পুটে নেবে জনগণের সম্পদ– তারা গরীবদের হক কেড়ে নিয়ে, তাদের বঞ্চিত করে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদের মালিক হবে এ ধারাবাহিকতা বছরের পর বছর ধরে আমাদেরকে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। সাধারণ মানুষ কোনোদিনই আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এভাবে আমরা এদেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সকল অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে; তাই আমরা মজলুম।

এরপর আমরা একের পর এক ক্ষমতার হাত বদল দেখেছি। এক পর্যায়ে ক্ষমতায় এলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তাঁর আমলে আমরা একই অবস্থা দেখেছি। পুঁজিবাদ ক্রমশ বিকশিত হয়েছে, সমাজে দারিদ্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, একশত লোকের মধ্য থেকে ২০টি লোক যদি হয় বিপুল পরিমাণ টাকার মালিক আর বাকি ৮০ জন হয় জাতীয় সম্পদের খুব কম অংশের মালিক, তাহলে দেখা যাবে যে, ঐ বিশ জনই আশি জন লোকের মালিক। এটাই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এ অর্থব্যবস্থাই মানুষে মানুষে পার্থক্য তথা ধনী-গরীবের মধ্যে পার্থক্যের মূল কারণ এবং এ কারণটা এখন পর্যন্ত বিরাজমান; বরং বর্তমান সময়ে এ পার্থক্যের মাত্রা আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। এখানে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, গরিবরা আরও গরিব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা সর্বহারা হয়ে যাচ্ছে। একদিন যারা ছিল জমির মালিক আজ তারা ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। এটা একটা সার্কেল, একটা চাকার মতো ঘুরছে। কে, কখন বেশি টাকার মালিক হয়ে বসবে তা বলা যাবে না। আবার কে কখন একেবারে সর্বহারা হয়ে বসবে তারও ঠিক নেই। এভাবে মানুষের ভাগ্য নিয়ে এক ধরনের জুয়া খেলা হচ্ছে। সকালবেলা আমির তো সন্ধ্যাবেলা ফকির। একেই বলা হয় পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা।

এরপর আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করতে চাই, তা হলো আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ। ইংরেজরা এদেশ দখলের পূর্বে এখানে মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারপর ইংরেজরা

এদেশে চালু করে নাচ-গানের সংস্কৃতি, মদ খাওয়ার সংস্কৃতি। সাথে সাথে মদের ব্যবসাও তারা চালু করে। দেশভাগের পর এ ধরনের সংস্কৃতি পাকিস্তান আমলে যেমন ছিল তেমনি বাংলাদেশ আমলেও চালু আছে; বরং তার মাত্রা এতো বেশি বেড়ে গেছে যে, গ্রাম-বন্দর ও শহরতলীতে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বত্র মদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে আর যুবক-যুবতীরা মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তুলছে। সেই সঙ্গে চলছে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা স্কুল-কলেজ, ইউনির্ভাসিটিতে, প্রমোদ অনুষ্ঠানে। সিনেমায় অশ্লীল অভিনয়, টেলিভিশন নাটকে সস্তা প্রেমচর্চা, যাত্রা-থিয়েটারে অনৈতিকতার ছড়াছড়ি আজকাল অত্যন্ত বেশি করে হচ্ছে। ফলে নারী-পুরুষের লজ্জা-শরম, শালীনতা, সতীত্ববোধ আজ অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সব দেখে মনে হয়, এ জাতিটা আজ এক উচ্ছৃঙ্খল ও জগাখিচুড়ি জাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, যে জাতি চরিত্র হারায় সে জাতি দুনিয়ার বুকে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না; চরিত্রহীন জাতির কোনো স্থান দুনিয়াতে নেই। আজ হোক কাল হোক তারা শেষ হয়ে যাবে দুনিয়া থেকে। দূর অতীতের ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে এ চিত্রই আমরা দেখতে পাবো।

কুরআন আমাদের সামনে অতীত জাতিগুলোর যে ইতিহাস পেশ করেছে তাতে দেখা যায় যে, চরিত্র হারানোর ফলে তারা দুনিয়া থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে– মুছে গেছে তাদের নাম-নিশানা। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পতনও তেমনিভাবে হয়েছে। আর মুসলমানদের যে দুনিয়াব্যাপী রাজত্ব ছিল তার পতনও এ নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের কারণে হয়েছে। বলতে গেলে, আমরা সেই পতনের অবস্থার মধ্যে আছি। পতন সৃষ্টিকারী এক একটা কাণ্ডকারখানা এমনভাবে ঘটে চলছে যা একটি জাতিকে চরমভাবে ডুবিয়ে দিতে পারে। তা থেকে জাতিকে বাঁচানোর কোনো চিন্তা-ভাবনা বা কোনো রকমের চেষ্টা-যত্ন করা হচ্ছে না। শুধু তা-ই নয় বরং তার উল্টোটাই করা হচ্ছে। সংস্কৃতির নামে নগ্নতা ও বেহায়াপনাকে জাতীয় উন্নতির উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ সব নোংরামি না করলে নাকি জাতির উন্নতি হয় না। এজন্য আজকে মেয়েদেরকে খেলার মাঠে যুবকদের সামনে আঁট-সাঁট পেশাক পরিয়ে খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সর্বপ্রকার খেলাধূলায় মেয়েদেরকে উপস্থাপন করা হচ্ছে পুরুষের সামনে, কোনো

গোপন স্থানে নয়। শুধু তা-ই নয় তাদেরকে বিদেশে পাঠানো হচ্ছে যুবকদের সাথে একই দলে। আমাদের দেশের মেয়েরা খেলাধূলায় কতটা অগ্রসর বিদেশিদের তা দেখানোর জন্য।

আমাদের এদেশের মুসলিম নারী সমাজের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল। তারা নিজেদের ঘরকে নিজেদের বসবাসের কেন্দ্র ও শান্তিময় আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করত। প্রয়োজনে তারা হিজাব পরে ঘরের বাইরেও বের হতো, এমনকি প্রয়োজনে তারা হাট-বাজারও করতো। কিন্তু ফ্যাশন হিসেবে, সৌন্দর্যের প্রদর্শনী হিসেবে, সংস্কৃতির ধারক হিসেবে মুসলমান মেয়েরা ঘর থেকে কখনও বের হতো না। কিন্তু এখন আমরা কী দেখছি। বৃটিশ আমলে আমরা কোলকাতায় থাকাকালেও মুসলমান ঘরের মেয়েরা যে স্টেজে নাচে একথা কখনো শুনতে পাইনি। কিন্তু যেই পাকিস্তান হয়ে গেল অমনি তারা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করল। আর এখন তো মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা আর নগ্নতা এমনভাবে বেড়ে গেছে যে, বায়তুল মুকাররম বা নিউমার্কেট এলাকায় তাদের বেপরোয়া ঘোরাফেরার দরুন পরহেজগার লোকদের পক্ষে চলাচল করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মুসলমান হিসেবে আর কত নীচে আমাদের নামতে হবে। তা-ই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এসব কিসের আলামত? সম্ভবত এ কারণেই তা চিন্তা করার সময় এসেছে।

এসব যা কিছু হচ্ছে সে সম্পর্কে আমি এক কথায় বলতে চাই, যে জনগোষ্ঠীটা মুসলমান জাতি নামে পরিচিত, সেই জাতিটাকে জাতি হিসেবে ধ্বংস করে ফেলার এক গভীর চক্রান্ত চলছে। মুসলিম জাতি যেন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, মুছে যায় যেন তাদের নাম ও নিশানা, মুসলমানরা যেন নিজেদেরকে আর মুসলিম জাতি হিসেবে পরিচয় দিতে না পারে! তারা যেন গরু-ছাগলের ন্যায় ভিন্ন এক জীব হিসেবে দুনিয়ায় বেঁচে থাকে এবং বেঁচে থেকে খুশি হয়, আন্তর্জাতিকভাবে তারই ষড়যন্ত্র চলছে– তা কেউ বুঝতে পারুক, আর নাই পারুক। সে অনুভূতি, সে চেতনা আমাদের থাকুক আর না-ই থাকুক। জাতি আজ সে দিকেই দিন দিন অগ্রসর হচ্ছে একথা আজ আমি আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই।

বর্তমান সময়ে আর একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করছি; তা হলো আমাদের এই নব্য সমাজে বাঙালি হবার প্রবণতা। আপনারা লক্ষ্য করবেন, বর্তমান সময়ের ছেলে-মেয়েদের নামে প্রায়শ মুসলমানিত্বের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

নামটা তারা বাংলায় এমনভাবে রাখছে যে, ছেলে কিংবা মেয়েটা কোনো মুসলমান ঘরের নাকি কোনো হিন্দু ঘরের নাকি কোনো খ্রিস্টান ঘরের– নাম শুনে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। অথচ মুসলমানদের নামের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এমন একটি স্বাতন্ত্র্য আছে যে, দুনিয়ার যে প্রান্তে সে বসবাস করুক না কেন, নাম শুনেই বোঝা যাবে সে মুসলমান। নামের এই বৈশিষ্ট্যটা যাতে হারিয়ে যায় সে প্রবণতাও আমাদের নব্যদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং একে খুব বেশি করে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে যেন মানুষের মধ্যে সর্বত্র একটা বাঙালি বাঙালি ভাব বিরাজমান থাকে। আর হচ্ছেও তাই। আমরা আসলেই নাকি বাঙালি জাতি! কিন্তু ইতিহাস যা বলে তাতে বাঙালি বলতে কিন্তু হিন্দু জাতিকে বুঝায়।[২] কোলকাতায় বাংলা ভাষাভাষী যে হিন্দুরা বসবাস করে তারা নিজেদেরকে বাঙালি বলে পরিচয় দেয়। সুতরাং বাংলা ভাষায় কথা বললে আমাদের বাঙালি হতে হবে এ যুক্তিটা থাকে কোথায়? দেখে শুনে মনে হয়, আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির দিকে খুব কৌশলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সম্ভবত এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু কালচারকে এদেশের মুসলমানদের নিজস্ব কালচার হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, রবীন্দ্রনাথ যে গানটি লিখেছিলেন মুসলমানদের স্বতন্ত্র পজিশন খতম করার জন্যে, সে গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ সে ইতিহাস কারো অজানা থাকার কথা নয়। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। ঢাকাকে রাজধানী করে ইংরেজরা তাদের কাজের সুবিধার জন্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্তমান বাংলাদেশ এলাকা এবং আসামকে নিয়ে আর একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বানাবার চেষ্টা করেছিল। কেননা বিশাল এ দেশ একজন গভর্নর শাসন করতে পারছিল না। সেজন্য তাদের প্রয়োজন ছিল এটাকে আলাদা করে আর একজন গভর্নর নিয়োগ করা। সে কারণে এখানে গভর্নর হাউজও বানানো হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এ এলাকার মুসলিমরা প্রাধান্য পেয়ে যাবে এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে তাদের উন্নতি সাধিত হবে বলে কোলকাতার হিন্দুরা শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়ে ছাড়ল। যার নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এজন্যে তিনি একটা গানও রচনা করেছিল। সেটাই বর্তমানে আমাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীত নামে খ্যাত। এ গানটি রেডিও ও টেলিভিশনে প্রায় বাজানো হয়; শুধু তা-ই নয় ছোট ছোট বাচ্চাদের অর্থাৎ প্রাইমারি লেভেল থেকে স্কুল পর্যন্ত লেখাপড়া

শুরুর প্রাক্কলে সেটি বাজানো হয়। এছাড়া সকল জাতীয় অনুষ্ঠানে এটাকে বাজিয়ে প্রকারান্তরে একথাই প্রমাণ করা হচ্ছে যে, আমরা পশ্চিম বাংলা থেকে আলাদা হলেও আসলে আলাদা নই আর আলাদা থাকাও ঠিক নয়। সোনার বাংলা বলতে যদিও আমরা বাংলাদেশকেই বুঝে থাকি; কিন্তু আসলে এ গানটি সমগ্র বঙ্গ প্রদেশকে নিয়েই লেখা। কাজেই সোনার বাংলা বলতে মূলত অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশকেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ আমরা যেন সারা বঙ্গ প্রদেশের সাথে মিলিত হয়েই আছি। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর এভাবেই প্রথম কুঠারাঘাত হানা হয়। আর এ যে এক বিরাট চক্রান্তের জাল বোনা, বলতে গেলে সে চেতনাটুকুও আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

রেডি-টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমের সহায়তায় এদেশে মুসলমানদেরকে হিন্দু কালচার গ্রহণ করার জন্য পুরোপুরি উৎসাহ দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এক ধরনের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা আজকাল বাজারে এমনভাবে ছেয়ে গেছে যেগুলো ভারতীয় সিনেমার নগ্ন নায়ক-নায়িকাদের ছবি ছাপিয়ে এদেশের উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদের চরিত্রকে পুরোপুরি ধ্বংস করার কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের প্রশাসনযন্ত্র এদিকে লক্ষ্য করার হয়তো প্রয়োজনই অনুভব করছে না।

মানুষকে দুনিয়ার বুকে জীবন যাপন করতে হলে একটি নীতি-আদর্শের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় একটা নিয়ম-নীতির, একটা সিস্টেমের, একটা পদ্ধতির, যাকে সামনে রেখে মানুষ তার প্রতিটি কার্য সমাধা করে। বন্য পশুদের এসবের প্রয়োজন হয় না। তাই জাতি গঠনের জন্যে আমাদের একটি জাতীয় আদর্শ বা মূলনীতি দরকার। কিন্তু যে সিস্টেম বা আদর্শকে আমাদের সামনে রাখা হয়েছে তা এক কথায় বলতে গেলে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। স্বাধীনতা-উত্তর ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার ১৯৭২ সনে সংবিধান রচনা করতে গিয়ে চার দফা মূলনীতি আদর্শ হিসেবে পেশ করেছিল, যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র। এ চারটি মূলনীতি অনুযায়ী শেখ মুজিবর রহমান '৭৩, '৭৪ এবং '৭৫ সনের আগস্ট পর্যন্ত দেশ শাসন করেছেন। এর মধ্যে এদেশবাসী কী দেখতে পেয়েছে? তারা দেখতে পেয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বাস্তব ফলটা কী। মুসলমানদের বাস্তব ও বৃহত্তর জীবনকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের সমাজে, রাষ্ট্রে, রেডিও-টিভিতে ইসলামের কোনো

কথা ছিল না। বরং ইসলামের বিপরীত সব চিন্তাধারা, ইসলামের বিপরীত সব ভাবধারা গড়ে তোলা হচ্ছিল। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বস্তুত ধর্মহীনতার কাজ করে যাওয়া হচ্ছিল।

এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পেলাম সমাজতন্ত্রের রূপ। বড় বড় মিল-কারখানা এ দেশীয় এবং পাকিস্তানিরা যা ছেড়ে গিয়েছিল তার সব কিছুই সরকার দখল করে নিল জাতীয়করণের নামে। তারপর যা হলো তা আরও মজার। মানে ক্ষমতাসীনরা এ সকল জায়গায় নিজেদের দলীয় লোক ও নিজেদের আত্মীয়-স্বজন বসিয়ে তাদের হাতে তা পরিচালনার ভার তুলে দিল। একদিকে কল-কারখানা চালানোর অনভিজ্ঞ প্রশাসন, অন্যদিকে কারখানার সম্পদ লুটপাটের কারণে বলতে গেলে প্রায় সব কারখানাই ক্রমে ক্রমে অচল হয়ে পড়ল। এসব অচল কারখানা সচল করার জন্যে ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা ওভার ড্রাফট নিয়ে খরচ করা হয়– যা আর কোনোদিন ব্যাংককে ফেরত দেয়া হয়নি।

মুজিব সরকারের এ সমাজতন্ত্রের অর্থ ছিল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের নিজস্ব লোকদেরকে সম্পদশালী করা। ফলে দেখা গেল, যারা একদিন কোনো রকমে খেয়ে-পরে জীবন যাপন করতো, তারাই কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে বসল খুব অল্প দিনের মধ্যে। তারপর বাধ্যতামূলকভাবে সমবায় সমিতি করে দেশের সকল জমি-ক্ষেত আওয়ামী লীগের কর্তাব্যক্তিদের হাতে তুলে দেয়া হলো। তারপর মহকুমাগুলোকে জিলা বানিয়ে তাদের লোকদেরকে গভর্নর করে দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে বসল। এরপর ১৯৭৫ সনের ২৬ মার্চ বাকশাল গঠিত হলো সমাজতন্ত্রকে পুরাপুরিভাবে প্রশাসনিক রূপ দেয়ার জন্যে। এর লক্ষ্য ছিল, দেশের যাবতীয় কল-কারখানার মালিক হবে সরকার। সে সাথে দেশের যাবতীয় জমি-ক্ষেতের মালিক হবে সরকার। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও মালিক সরকার হবে। জনসাধারণ সরকারের ক্ষেত-খামারে চাষাবাদ করবে মজুরির বিনিময়ে। কল-কারখানায় কাজ করবে মজুরি পাবে, কিন্তু তারা কোনো কিছুরই মালিক থাকবে না।

অন্যদিকে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বেআইনী বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাকশাল নামে একটি মাত্র দল গঠন করা হলো; যেমন করে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হয়ে থাকে। সোভিয়েট রাশিয়ার যেমন একটি মাত্র পার্টি ছিল। সে পার্টির

যিনি কর্মকর্তা তিনিই ছিলেন দেশের সর্বাধিনায়ক। তেমনি এখানে বাকশালের সভাপতি ও চেয়ারম্যান শেখ মুজিব আর দেশের প্রেসিডেন্টও তিনি। শুধু তা-ই নয়, দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দুই-তিনটি পত্রিকা চালু রাখা হলো। ইত্তেফাকের মতো পত্রিকাও সরকারি মালিকানায় দেয়া হয়েছিল। এগুলো হলো এ দেশে সমাজতন্ত্র চর্চার ইতিহাস। কিন্তু সে সমাজতন্ত্র দ্বারা এদেশের জনগণের কোনো কল্যাণ হয়নি বরং জনগণের অধঃপতন হয়েছে, তার ওপর চরম নির্যাতন ও নিষ্পেষণ হয়েছে। বলতে গেলে সে সমাজতন্ত্র চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এদেশের জনগণ তা কোনোভাবে মেনে নিতে পারেনি। পরিণতিতে মুজিব সরকারের পতন হয়েছে।

তারপরে এলেন সেনা শাসক জিয়াউর রহমান। তার সময় থেকে শুরু করে এরশাদের সময় পর্যন্ত আমরা এখানে পুঁজিবাদী শাসন দেখেছি। অনেকটা পাশ্চাত্য ধরনের শাসন।[৩] সেই সঙ্গে কখনো ইউরোপকে অনুসরণ করা কখনো ভারতকে অনুসরণ করা আবার কখনো বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আপন করে নেয়া। ইতঃপূর্বে ঢাকার রাস্তায় মূর্তির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ভাস্কর্যের নামে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুকরণে মেডিকেলের মোড়ে নির্মিত হয়েছে দোয়েল পাখির মূর্তি। তারপর এরশাদ সাহেব সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে পিজি হাসপাতালের পার্শ্বে একটি হরিণের প্রতিকৃতি দাঁড় করিয়েছেন। তার মানে, হিন্দুরা যেমন মাটি দিয়ে মূর্তি বানায়, তেমনি পাথর দিয়ে এ মূর্তি বানানো হয়েছে। এখন ঢাকার রাস্তায় মুসলমানদের চলাচল করতে মূর্তির সাথে পরিচয় না হয়ে আর পারছে না। এটাও যে এক ধরনের শিরক এ অনুভূতি আমাদের মাঝে নেই। তাই এর কোনো গুরুত্বই কেউ দিচ্ছে না। এর চেয়ে মুসলমানদের আর কী অধঃপতন হতে পারে আমার বুঝে আসে না।

আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে একটি রাজনৈতিক ধারা চলে আসছে। সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ধারা। রাজনৈতিক নেতারা জনগণের কাছে যান ভোটের জন্যে। জনগণ ভোট দেয় ও নেতারা ভোট নিয়ে ক্ষমতায় যান। পরে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো কর্তৃত্ব চালাতে থাকেন। কারণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে এ অধিকার তারা পেয়ে থাকেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। আসলে ব্যাপারটা কী ঘটে, একটু খতিয়ে দেখুন– যারা নির্বাচিত হয়ে আসেন

তারা ততখানি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হন না দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে, যতখানি যোগ্যতা রাখেন সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারিরা। তারা একাধারে অতি উচ্চ শিক্ষিত ও সরকারের সব বিষয়ের ওপর ট্রেনিংপ্রাপ্তও হয়ে থাকেন এবং সাথে সাথে তারা ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কাজকর্মের ওপর দীর্ঘ অভিজ্ঞতাও রাখেন। বিভিন্ন সময়ে সরকার আসে, সরকার যায়, কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারিদের অবস্থান সহজে পরিবর্তিত হয় না। কখনও কখনও তাদেরকে এক ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলি করা হয়, এতোটুকু। অন্যদিকে মন্ত্রী-মিনিস্টার যারাই হন তাদের অনেকে নতুন। হয়তো কাজকর্ম কিছুই বুঝেন না। এ সুযোগে আমলারা তাদেরকে নানাভাবে ভুল বুঝিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো চালাতে চেষ্টা করে। অথচ এর সকল দায়-দায়িত্ব আমলাদের ওপর বর্তায় না। ফল দাঁড়ায় এই, যে কাজ করার ছিল তা করা হয় না আর যা করণীয় নয় তা-ই করা হয়– এভাবে চলে দেশের সেক্রেটারিয়েট।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে সিস্টেম চলছে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে, তাতে এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে ক্ষমতাসীন হবার লোভ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। বলতে গেলে, ক্ষমতার জন্য লড়াই চলছে সর্বপর্যায়ে। এদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতা, সিভিলিয়ান বুদ্ধিজীবী, উচ্চ সরকারি চাকরিজীবী সকলেই ক্ষমতার জন্য কাঙাল। আর এখন তো সামরিক অফিসারদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এখন আর ভিন দেশের লোক নয়। তারা আমাদেরই দেশের গ্রাম-গঞ্জ থেকে আসা আমাদেরই সন্তান, আমাদের জাতিরই অংশ–বাংলাদেশের নাগরিক; এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সামরিক বাহিনী গঠন করার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে; বিশেষ প্রয়োজনে তাদের গঠন করা হয় এবং তাদের লালন-পালন করা হয়। জাতীয় বাজেটের বলতে গেলে বিরাট অংশ তাদের জন্যেই বরাদ্দ থাকে। তাদের কাজ হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা অর্থাৎ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব এ বাহিনীর ওপর ন্যস্ত থাকে যেন বিদেশী কোনো শক্তি আমাদেরকে গ্রাস করতে না পারে, আমাদের ভৌগলিক সীমারেখার কোনো অংশ যাতে অন্যরা দখল করে নিতে না পারে। অর্থাৎ আমাদের ওপর কোনো বহিঃশক্তি আক্রমণ করলে তার মোকাবেলা করাই সেনাবাহিনীর আসল কাজ। এ

কারণে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের বেতন-ভাতা, তাদের বাসস্থান, খানা-পিনা এসবও থাকে অতি উচ্চ মানের, যা নাকি জাতির অন্যান্য সাধারণ মানুষের জন্য নয়। মনে রাখবেন, এদের পিছনে যে অর্থ ব্যয় হয় তা কিন্তু এদেশের জনগণের– আপনাদের, আমাদের। অথচ তাদের মাঝেও কখনও কখনও ক্ষমতার লোভ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি তাদের মধ্যেও যে কেউ নিজেকে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাবে না এমন কথা বলা যাবে না। ১৯৭৫ সনে মেজর-কর্নেলরাই ক্ষমতা দখল করেছিল। সামরিক বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে যারা থাকেন তাদের পক্ষে ক্ষমতা দখল করা কোনো ব্যাপারই নয়। কমান্ড যার হাতে থাকে সেই ক্ষমতা দখল করতে পারে। বিচারপতি সাত্তার সাহেবের সরকারকে সেনাপতি এরশাদ সাহেব কীভাবে ছিনিয়ে নিলেন তা তো সকলেই জানেন। এই হলো আমাদের দেশের রাজনীতির অবস্থা।

রাজনীতি চিরকাল জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটা বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটা জনগণের একচেটিয়া ব্যাপার ছিল। জনগণ নিজেদের পছন্দমতো এক একটি রাজনৈতিক দলে শামিল হয়ে তাকে সুপরিচিতি করে তুলত আর রাজনীতিবিদরা দলীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে রাজনৈতিক পন্থায় ক্ষমতা দখল করতে চাইত এই জনগণেরই সমর্থন নিয়ে। এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনী ও সেক্রেটারিয়েটের বড় বড় আমলাদের চক্রান্তের ফলে রাজনীতিটা এখন একটা মারাত্মক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ক্ষমতালোভীদের জন্য।[৪] একই ধারাবাহিকতায় জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসেন। তিনি ক্ষমতাসীন হয়ে রাজনীতির গোটা সিস্টেমটাকেই একেবারে অকেজো করে দেন এবং নানাভাবে ও নানা কৌশলে নিজ ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে রাজনীতির চরিত্রটাকেই একেবারে ধ্বংস করে ফেলেন।

তাই রাজনীতি এখন আর জনগণের হাতে নেই আগের মতো। জনগণ ইচ্ছে করলেই কোনো লোককে ক্ষমতাসীন বানাতে পারে না। এখন আর ভোটারদের ভোট দেবার দরকার হয় না। পুলিং বুথে গিয়ে ভোট প্রয়োগের পূর্বেই অনেকের ভোট দেয়া হয়ে যায়। প্রার্থী তার ইচ্ছামতো ভোট পত্রে সীল মেরে আগে থেকেই বাক্সের মধ্যে ভরে রাখে ক্ষমতাসীনদের সহায়তায়। জনগণ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তারা নিজের ইচ্ছেমতো

কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচিত কিংবা নিজের পছন্দনীয় প্রার্থীর পক্ষে রায় জানাতে পারে না। এখন জনগণ যাকে ভোট দেয় সে নির্বাচিত হয় না বরং যাকে ভোট দেয় না সে নির্বাচিত হয়। এতদিন ধরে নির্বাচনের যা-ও একটা সিস্টেম চলে আসছিল সেটাও খতম হয়ে গেছে। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা একটা বিরাট দেশের প্রতিবেশী। সে দেশের সাহায্য নিয়েই '৭১-এ এদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা হয়েছিল। ফলে আমরা নাকি তাদের কাছে অনুগৃহীত বা ঋণী হয়ে আছি। কিন্তু সে ঋণ তো নগদে শোধ করা হয়েছিল তাৎক্ষণিকভাবেই। পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। তারপরেও তারা দুই-তিন বছরে ৬ থেকে ৭ শত কোটি টাকা এখান থেকে নিয়ে গেছে লুটপাট করে। তা দিয়েও নাকি আমাদের ঋণ শোধ হয়নি। এখনও প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার মালপত্র পাচার হয়ে যাচ্ছে। এও নাকি আমাদের সেই ঋণ শোধ করার জন্য লাগছে। শুধু তা-ই নয়, এরপরেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কথামতো ওঠা-বসা করতে হবে। আজকে এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সামনে নতজানু ভূমিকা গ্রহণ না করলে নাকি এদেশের শাসক হওয়া যায় না আর থাকাও যায় না।

আপনারা নিশ্চয়ই তালপট্টি সমস্যার কথা জানেন। তৎকালীন জাতীয় সংসদে জিয়া সরকার শ্বেতপত্র দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, সেটা আমাদের দেশেরই অংশ এবং তাকে কিছুতেই বিতর্কিত স্থান বলা যাবে না। কিন্তু পরবর্তী সরকার আমাদের বলেছে যে, ওটা বিতর্কিত। তখন থেকে সরকার এত নীতি স্বীকার করে আছে যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হচ্ছে, জবাই করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত– সে সম্পর্কে কোনো প্রতিবাদ করলে বলা হয় যে, ওটা তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমাদের এ ভূখণ্ডটি একটি মুসলিম দেশ। কিন্তু আমাদের ওপরে ক্ষমতাসীন হয়ে মুসলিম হিসেবে তাদের যে চরিত্র থাকা দরকার তা আমরা তাদের মাঝে দেখতে পাই না।

এই ঢাকা শহরে রাতের বেলা এমন সব কাণ্ড ঘটে থাকে যে, একটি মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচয় দিতে আমাদের লজ্জা হয়। রাত-দুপুরে যখন সাধারণ মানুষ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তখন ঢাকার আর একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়। তখন এ শহরেরই অন্যদিকে এক জাগরণ শুরু হয়। আর তা হলো বড় বড় হোটেল-ক্লাবে জুয়া খেলা আর মদের আডডা। শুধু কি তাই, সেখানে সব বড়

বড় টাকাওয়ালা আসে তাদের গাড়ি নিয়ে। শোনা যায়, সে গাড়ির চাবিগুলো থাকে একটি টেবিলের উপরে ছড়ানো ছিটানো। এরপর চলে নাচ-গান আর মদ্যপান। সেখানে একের স্ত্রী অপরের গলা জড়িয়ে নৃত্য করে। স্বাধীনতা দেয়া হয় প্রতিটি লোককে যে যার ইচ্ছামতো চাবি তুলে নিতে পারে। সে চাবি দিয়ে যার গাড়ি খোলা যাবে এবং সে গাড়িতে যে স্ত্রীলোকটি থাকবে ঐ রাতের জন্য সে স্ত্রীলোকটি তার। এ ঢাকা শহরে এসব কিছু হচ্ছে এক ধরনের এলিট শ্রেণির মধ্যে। একজনের বউ অন্য জনের গলা জড়িয়ে না নাচলে নাকি তাদের প্রেস্টিজ থাকে না। এভাবে সমগ্র জাতিকে নৈতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে খতম করে দেয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় আদর্শের দিক দিয়ে, ঈমানের দিক দিয়ে কী থাকবে এ জাতির– আর আছেই বা কী?

আমাদেরকে বলা হয়, আমরা গরিব জাতি। আর গরিবির সুযোগ নিয়ে দেশজুড়ে চলছে জন্মনিয়ন্ত্রণের অভিযান। এ অভিযান হচ্ছে আসলে যুবক-যুবতীদের চরিত্র ধ্বংসের অভিযান। যুবতী নারী বা অবিবাহিত নারী পর পুরুষের সাথে মেলামেশার সবচেয়ে বড় বাধা হলো গর্ভবতী হওয়া। এর থেকে সে যদি নিরাপত্তা লাভ করে আর তখন যদি তার আল্লাহর ভয় না থাকে তবে কে তাকে নষ্টামি আর ব্যভিচার থেকে বাঁচাতে পারে, বলুন? তাই আজকে দেখা যাচ্ছে অন্যায়-অপরাধে সমাজ ভরে গেছে। এ দুঃসহ অবস্থার সম্মুখীন আমরা, এদেশের জনগণ।

তাই আমি প্রথমে যে বলেছি, এদেশের মানুষ মজলুম, এদেশের মানুষ মাহরুম, সেটা অত্যন্ত প্রকটরূপে দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে আমাদের মুক্তির উপায় কী? আমরা মুসলমান হয়ে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকব এবং দেশটাকে রসাতলে যেতে দেবো; দেশ যদি রসাতলে যায় আমরা কি তার থেকে বাঁচতে পারব? এদেশের ধ্বংস মানে আমাদেরও ধ্বংস। আমাদের যদি বাস্তবিক কিছু চেতনা থেকে থাকে, তবে এ অবস্থা সম্পর্কে এখনই চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

এখানে যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে দেশের সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পরিধি কতদূর পর্যন্ত? বলতে গেলে নির্বাচন পর্যন্ত এবং তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের মনের কামনা-বাসনা, তাদের চিন্তা-চেতনা বা চেষ্টা-সাধনা, আন্দোলন সব কিছুই নির্বাচনকে নিয়ে। তাদের কাছে নির্বাচন এমনই এক জিনিস যে, সেটা হয়ে গেলে এ জাতির, এ দেশের আর কোনো

সমস্যা থাকবে না। সকল সমস্যার সমাধান এনে দেবে নির্বাচন। তাই তারা বলেন নির্বাচন দাও। তাতে জনগণ যাকে ভোট দেবে সে নির্বাচিত হবে এবং সে-ই ক্ষমতায় যাবে। কিন্তু সেই যে নির্বাচনের একটা সিস্টেম ছিল সেটাকেও একেবারে অর্থহীন করে দেয়া হয়েছে– সে সম্পর্কে এই নির্বাচনপন্থীদের বুঝ আসে নি। আসল কথা হচ্ছে, যিনি ক্ষমতায় থাকবেন পাল্লা তার দিকেই ভারী থাকবে, তাতে প্রশাসনে যতোই রদবদল করা হোক না কেন। যে কোনো মূল্যে তিনি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করবেন, এটা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ।

তাই এটা আজকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতার কাঙ্ক্ষিত হাত বদল আর সম্ভব নয়। এর ওপর রয়েছে বিদেশী প্রভুদের ইশারা-ইঙ্গিত। তাদের মতামতেরও বিরাট একটা প্রভাব এ নির্বাচনের ওপর পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, তাদের মনঃপূত দল বা ব্যক্তিকে নানাভাবে প্রভাব খাটিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হয়। তাই আমি আবার বলছি, যে ভোটাভুটির মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হতে বা কাঙ্ক্ষিত দল নির্বাচিত হতে পারত সেটা এখন আর নেই। সেই সিস্টেমটাও বর্তমানে শেষ হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে আমি সকলকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বারবার অনুরোধ জানিয়ে আসছি। কিন্তু গণতন্ত্র নামক এক অন্ধ জাহিলি ব্যবস্থা এমনভাবে আমাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে রেখেছে, এর থেকে কী করে নিস্তার পাবো আমার জানা নেই।

এটা জনগণকে আজ পর্যন্ত কোনো কল্যাণ এনে দিতে পারেনি। তারপরও কী এক অন্ধ মোহে আমরা পড়ে আছি। এই ধোঁকাবাজি আর প্রতারণার সিস্টেম ইংরেজরা আমাদের দেশে চালু করে গেছে, যেন এদেশের মানুষ চিরদিন ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারে। এমনকি ইসলাম কায়েম করার জন্যও তারা যেন একেই একমাত্র পন্থা হিসেবে গ্রহণ করে। কেননা এটা গ্রহণ করলে আর কোনোদিন ইসলাম কায়েম হবে না। মানুষ ক্ষমতাসীন হবার জন্যে যুদ্ধ–সংগ্রাম করতে থাকবে এবং এ কাজ নিয়েই তারা সদা ব্যস্ত থাকবে; ফলে আসল কাজ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। ইংরেজদের তৈরি এ বুদ্ধির ফাঁদে আমরা পা দিয়ে বসে আছি। পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতন্ত্রের সাহায্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা করছি। কিন্তু ইসলাম কি গায়রে-ইসলামী পন্থায় কায়েম হতে পারে? আসলে এক বিরাট ধোঁকার মধ্যে আমরা এখনও পড়ে আছি।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমার জীবনের ইতিহাসও অনেকটা এ রকমই। আমিও অন্যান্যদের মতো এদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করেছি। আমার জীবনের প্রথম ভাগ, জীবনের প্রধান অংশ– যেটা কর্মতৎপরতার অংশ– সেটা আমি ঐ কাজেই ব্যয় করেছি। আমি অবশ্য ১৯৭০ সনেই আমার অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছিলাম যে, পাশ্চাত্যের এই ধর্মহীন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে কখনও ইসলাম কায়েম হতে পারে না। এ কথা আজ মানতে হবে, সেদিন এ ব্যাপারে কোনো বিকল্প ধারণা আমাদের মাঝে ছিল না বলে ঐ প্রক্রিয়া আমরা অবলম্বন করেছিলাম। আমাদের সামনে সহজ হিসেব ছিল যে, নির্বাচন করবো– জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবো এবং প্রথম নির্বাচন, দ্বিতীয় নির্বাচন ও তৃতীয় নির্বাচনের পরে এমন একটি সময় আসবে যখন আমরা সংসদে শতকরা ৫৫টা সিট পাবো। এভাবে সংসদে মেজরিটি হয়ে একদিন ইসলামী হুকুমত কায়েম করে ফেলবো।

আমার জীবনের এ অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি যে, আমরা একটা চরম প্রতারণার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছি। একটা মরীচিকার পিছনে আমরা ছুটে চলছি অনবরত। মনে করছি– এই হচ্ছে, এইবার হয়ে যাবে, এভাবে এক ধরনের নেশা আমাদের পেয়ে বসেছে। আজ এর বিরুদ্ধে কথা বললে এক শ্রেণির লোক বলে, এ লোকটা গণতন্ত্রই মানে না। গণতন্ত্র না মানাটাই যেন একটা বড় অপরাধ। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, গণতন্ত্র– কিসের গণতন্ত্র? কে দিয়েছে গণতন্ত্র? এটা কি আল্লাহ দিয়েছেন না তাঁর রাসূল (সা.) দিয়েছেন? এ পদ্ধতি তো কখনো আল্লাহর রাসূল (সা.) দেন নি।

আসলে যে প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে নির্বাচন হচ্ছে, যে সিস্টেমে লোকদের ভোট নেয়া হচ্ছে, এটা ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন ইহুদীদের তৈরি। যদিও বলা হয়, আব্রাহাম লিংকন এ থিউরিটা দিয়েছে, কিন্তু মূল ব্যাপারটা তা নয়। আমি অন্যান্য বক্তৃতায় এর ইতিহাস বর্ণনা করেছি বহুবার। মূলত এটা ইসলামী চেতনা ও ইসলামী লক্ষ্যকে ব্যাহত করার একটা মস্ত বড় হাতিয়ার। এটা ব্যর্থ করে দিয়েছে পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনকে এবং দুনিয়ার যেখানেই এ পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করা হবে সর্বত্র ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। যারা সত্যিকার ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে চায় তাদেরকে আমি চিরদিনের জন্য নিশ্চয়তা দিতে পারি– এ পথে ব্যর্থতা ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না।

এবার আমি তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই, যারা বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত করতে চান। তাদের জন্যে একটিমাত্র পথ খোলা রয়েছে: তা হলো, এদেশের মুসলমানদেরকে ইসলামের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের সক্রিয় এবং জাগ্রত করে গণ-অভ্যুত্থান ঘটানো– এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। এজন্য জিহাদ, শাহাদাত হচ্ছে অনিবার্য স্তর। আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে করীম (স.)-এর ইতিহাস এবং অন্যান্য নবী-রাসূলগণের ইতিহাস গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস, নির্বাচনের ইতিহাস নয়। আমি সে ইতিহাসের দিকে আপনাদের দৃষ্টি-নিক্ষেপ করতে বলছি।

রাসূলে করীম (সা.)-এর দাওয়াতে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান তৈরি হয়েছিলেন মক্কায় এবং আশেপাশের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে। আল্লাহর হুকুমে তিনি যখন সকল মুসলমানকে মদীনায় হাজির হতে নির্দেশ দিলেন, সাথে সাথে ঐ মুসলমানরা বহু কষ্টে মদীনায় গিয়ে হাজির হলেন। ইতঃপূর্বে সেখানকার জনগণ ইহুদী বংশের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে রাজা বানাবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সেজন্য তারা রাজমুকুটেরও ব্যবস্থা করেছিল। ঠিক এ সময়ে রাসূলে করীম (সা.)-এর নেতৃত্বে মদীনায় যে মুসলিম জনসমাবেশ হলো তা দেখে ঐ এলাকার জনগণ হতচকিত হয়ে গেল। এর ফলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে রাজা বানানোর সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম বানচাল হয়ে গেল। অচিরেই এক বিরাট মুসলিম জাগরণ– মুসলিম শক্তির অভ্যুত্থান সংঘটিত হলো এবং সে শক্তির মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না ভেবে ইহুদীরা উবাইকে রাজা বানানোর পরিবর্তে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথে মদীনা সনদে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলো। ফলে মুহাম্মাদ (সা.)-এর নেতৃত্ব এবং তার সুপ্রিমেসি প্রতিষ্ঠিত হলো। তাই নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি, এটি একটি গণঅভ্যুত্থানই ছিল, আর কিছু নয়। সুতরাং আজকে আমাদের সে পন্থায়ই কাজ করতে হবে। এটাই হলো ইসলাম কায়েমের নবুয়্যতী পন্থা। এর মাধ্যমেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এরপর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তা হচ্ছে, আমরা মুসলমান আর মুসলমানদের জীবনাদর্শ হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম অনুযায়ী তাই আমাদের জীবন যাপন হওয়া উচিত, কিন্তু তা হচ্ছে না। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন, শাসন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য–

আমাদের রাজনীতি-অর্থনীতি সব কিছুই কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু তা হচ্ছে না। এর কারণ মুসলমান হিসেবে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের পালন করার কথা ছিল তা আমরা করিনি। সে দায়িত্ব ও কর্তব্য যদি আমরা পালন করতে চাই তাহলে প্রয়োজন হবে রাজনৈতিকভাবে এ কথা স্বীকার করে নেয়া যে, এদেশের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ– কোনো মানুষ নয়। এদেশের কোনো মৌলিক আইনের উৎস জনগণ নয়, পার্লামেন্ট নয়, বরং সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহর কুরআন ও রাসূলে করীম (সা.)-এর সুন্নাতে যে আইন আছে সে আইনগুলোকেই জারী করতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং তাকেই এদেশের মৌলিক আইন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সে অনুযায়ী সরকার চলবে, বিচার ব্যবস্থাও চলবে। বর্তমান সময়ে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে তাকে খতম করে দিয়ে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চালু করতে হবে– যা পুঁজিবাদও নয় সমাজতান্ত্রিকও নয়– অথচ প্রত্যেকটি মানুষের তা মৌলিক অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আমরা কুরআন ও হাদীসে যে অর্থনীতি দেখতে পাই তাতে প্রতিটি মানুষের খাওয়া, পড়া, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা– এ পাঁচটি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। দুনিয়ার অন্য কোনো অর্থনীতি– তা পুঁজিবাদই বলুন আর সমাজতন্ত্রই বলুন– নাগরিকদের এ পাঁচটি মৌলিক অধিকার স্বীকার করতে রাজী নয় এবং কখনও তা করেও নি। দুনিয়ার ইতিহাসে শুধু ইসলামই ঘোষণা করেছে যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা যেখানেই হবে সেখানে প্রতিটি নাগরিক এ পাঁচটি জিনিসের মৌলিক অধিকার পাবে। যদি নিজের অর্থ উপার্জন দ্বারা ব্যক্তির ঐ পাঁচটি অভাব পূরণ হতে পারে তবে ভালো। আর যদি সে তা না পারে– এ পাঁচটি জিনিসের কোনো একটি থেকেও যদি সে বঞ্চিত থেকে যায়, তা হলে সমাজ ও রাষ্ট্র তা পূরণ করে দেবে; তা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। এ ব্যবস্থা কেবল ইসলামই দেয়– কুরআন-সুন্নাহই নিশ্চিত করে। এ ব্যবস্থায় ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব বানানোর কোনো সুযোগ নেই; বরং ধনীকে আরও ধনীর হবার সুযোগ কমিয়ে দেয় এবং গরীবকে আরও গরীব ও নিঃস্ব হবার পথ বন্ধ করে দেয়। এমনকি এ ব্যবস্থায় গরিব ক্রমে ক্রমে সচ্ছলতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এভাবে ধনী ও গরীবের মাঝে যে বিরাট ব্যবধান তা ছোট হয়ে

আসে। ফলে সেখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মৌলিক অধিকার নিয়ে খেয়ে পরে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচতে পারে। এমন একটা সুন্দর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শুধু কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া সম্ভব। সে ধরনের একটি ব্যবস্থা এদেশের জনগণের একান্তভাবে কাম্য; কিন্তু তা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

আমি ইতঃপূর্বে আপনাদের সামনে নৈতিক অবক্ষয়ের কথা আলোচনা করেছিলাম। দেশে কত শাসক এলো আর গেল; কিন্তু কেউই জনগণকে এ থেকে রক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। এই যে দেশে মদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে সেটাকে বন্ধ করবে কে? কখনও যদি সমস্যা দেখা দেয় তবে হয়তো একটা অর্ডিন্যান্স জারি করা হবে। তাতে প্রকাশ্যে হয়তো মদ্যপান করা হবে না; কিন্তু গোপনে প্রচুর পরিমাণ মদ খাওয়া হবে– তা রোধ করা বা বন্ধ করার ক্ষমতা কার আছে? কেননা শুধু আইনের দ্বারা, শুধু শাসন-দণ্ডের দ্বারা, সরকারি প্রশাসন দ্বারা আইনকে পুরোপুরি কার্যকর করা যায় না– কার্যকর করা সম্ভবও নয়। এটা মানুষের প্রকৃতির বিরোধী। কেননা মানুষ যদি বুঝতে পারে যে সে ধরা না পড়লে শাস্তি হবে না। তাহলে সে গোপনে এমনভাবে কাজ করবে যেন ধরা না পড়তে হয়। এছাড়া আইন কার্যকর করার জন্য যে প্রশাসন আছে– যেমন পুলিশ বিভাগ, দুর্নীতি দমন বিভাগ, সি.আই.ডি, ইত্যাদি– যাদের দ্বারা আপনি দোষী ব্যক্তিকে ধরবেন, শাস্তি দেবেন তাদের দুর্বলতার কারণেও অপরাধীরা বেঁচে যায়। প্রশাসন যন্ত্র যদি একই দোষে দোষী হয় তাহলে স্বভাবতই তারা কোনো দোষী ব্যক্তিকে ধরবে না বা কাউকে শাস্তি দেবে না। ফলে দোষী ব্যক্তিরা রেহাই পেয়ে যাবে, নিষ্কৃতি পাবে এবং তারা আরও বেশি করে খারাপ কাজ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই কেবল আইন প্রয়োগ বা আইনের শাসন দ্বারা অপরাধ দমন করা সম্ভব নয়।

অপরাধ দমন করতে হলে, তাকে প্রতিরোধ করতে হলে মানুষের মাঝে ঈমানের জাগরণ তুলতে হবে। তাদের মধ্যে এ চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে যে, আমরা মুসলমান আমাদের দ্বারা কোনো খারাপ কাজ, কোনো অন্যায় অশ্লীল কাজ হতে পারে না হওয়া উচিত নয়। আমাদেরকে একদিন স্রষ্টার সামনে দাঁড়াতে হবে এবং যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে; এর থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাই আমাদের সকলের মাঝে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলে জনগণ অন্যায়ের মোকাবেলায়

ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। মনে করুন, কোনো একটি গ্রামে যদি কিছু লোক অসামাজিক কোনো কাজে লিপ্ত হয়, যেমন ধরুন মদের আড্ডা বা ব্যভিচারের আড্ডা বসায় আর তখন গ্রামের লোকেরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তাহলে ঐ লোকেরা কোনো খারাপ কাজ করতে সাহসই পাবে না। আর যদি গ্রামের জনগণ চুপচাপ বসে থাকে, খারাপ কাজের বিরুদ্ধে কোনো কিছু না-ই বলে বা তাদের মধ্যে যদি অন্যায়ের প্রতিরোধ করার মতো শক্তি না থাকে তবে সমাজ যে অন্ধকারে তলিয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্ততপক্ষে কোনো একটি এলাকার বেশিরভাগ জনগণের মধ্যে চেতনা গড়ে তোলা যায় যে, আমরা অন্যায় করবো না, অন্যায় হতেও দেবো না– তবে সে এলাকাটা অন্যায়-অপরাধমুক্ত হয়ে থাকতে পারে।

শুধু পুলিশী ব্যবস্থা দিয়ে সমাজকে অপরাধমুক্ত করা কখনও সম্ভব নয়। এ কথাটির প্রমাণ আজ আমরা বর্তমান সমাজ থেকেই পেতে পারি। এছাড়া আমাদের দেশে দুর্নীতি দমন বিভাগ রয়েছে দুর্নীতি দমন করার জন্য। পুলিশ বিভাগ রয়েছে চোর-ডাকাত ধরার জন্যে। এমতাবস্থায় তো দেশে দুর্নীতিও থাকার কথা নয় আর চোর-ডাকাতও থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাই? দিন দিন এসবের সংখ্যা বরং বেড়েই চলেছে। তাহলে এর মূল কারণ কী? কারণটা হচ্ছে, আমাদের জাতীয় পর্যায়ে যে কাজ হওয়া দরকার ছিল তা হচ্ছে না অর্থাৎ একটি জাতিকে দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে একটি আদর্শের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে আদর্শ কার্যত আমাদের নেই।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা যখন চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তখন সর্বপ্রকারের পাপাচার, নির্যাতন, শোষণ, ব্যভিচার, শিরক, মূর্তিপূজা ইত্যাদি পঙ্কিলতার মধ্যে তারা ডুবে ছিল। আবার এই এরাই যখন পড়ল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর আদর্শকে যখন তারা গ্রহণ করল, তখন তাদের মাঝে পরিবর্তন আসতে শুরু করল এবং আরবরাই যখন ঐক্যবদ্ধ হলো, মদীনা নগরীতে তখন একটা পবিত্র সমাজ গড়ে উঠল। সে সমাজে পাপ আর দুষ্কৃতি কোনো স্থান পেল না। যখনই আল্লাহর তরফ থেকে কোনো কিছু নিষেধ করা হয়েছে– হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, কার্যত তখনই তা বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা আর হতে পারেনি। যে

আরবরা সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে পরস্পর মারামারি করত– বংশানুক্রমে যুদ্ধ চালাত– এই আদর্শ গ্রহণ করার ফলে তাদের মাঝে এমন এক পরিবর্তন এল যে, তারা পরের জিনিস খেতে বা নষ্ট করতে এক বিন্দু প্রস্তুত হতোনা। এমন এক অবস্থা দাঁড়াল যে, তারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গিয়েও কিছু খেতে সহজে রাজী হতো না শুধু এই ভয়ে যে, এটা দ্বারা পরের হক খাওয়া হয় কি না? এটা জায়েয কি না? তারা এমনভাবে সচেতন থাকত যে, তাদের দ্বারা এমন কোনো কাজ যেন না হয় যেটা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। এভাবে তাদের মাঝে একটি বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। আসলে এ সব কিছু সম্ভব হয় তখন, যখন জাতির জীবন একটি আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

আমাদের দেশের শাসকরা– এতদিন পর্যন্ত যারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে এসেছেন– তারা যেহেতু সকলেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইসলাম সম্পর্কে বলতে গেলে তারা তেমন কিছুই জানে না, আর ইসলামী আদর্শকে তারা অনুসরণও করে না। ফলে এ সম্পর্কে তাদের চেতনা একেবারেই কম। তাই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জাতি গঠন করতে তারা রাজী নয়, বরং ইসলামী আদর্শকে এ জাতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সর্বপ্রকারের চেষ্টা ও আয়োজন তারা করে চলছে।

এর একটি কারণ হলো এই যে– ইসলামী আদর্শের প্রতি তাদের পূর্ণ বিশ্বাস নেই। আর যে আদর্শের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই সে আদর্শকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়াই হচ্ছে সমাজ থেকে, রাষ্ট্র থেকে ক্রমে নিজদেরকে অপসারণ করে নেয়া এবং সে আদর্শের প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করে– তার প্রতি যাদের পূর্ণ ঈমান আছে– তাদেরকে স্থান করে দেয়া। যে ক্ষমতার জন্য মানুষ এতো কিছু করে সেখান থেকে নিজকে সরিয়ে এনে কেউ কি অপরকে রাস্তা করে দেয়? নিজের কবর কি কেউ নিজ হাতে তৈরি করে? তাই দেখা যায়, মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব আজ ধ্বংসের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ জাতিকে এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এগিয়ে আসছে না। মুসলমান হয়েও জাতি হিসেবে নিজদেরকে প্রতিষ্ঠা করার কোনো তাগিদ তারা অনুভব করছে না। এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ– এর চেয়ে বিবেকহীনের মতো কাজ আর কী হতে পারে?

এ জাতি কেমন করে বাঁচবে আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন। একটু বিবেচনা করে দেখুন, এর ভবিষ্যত কী? দেশজুড়ে একটা লুটপাটের

প্রতিযোগিতা চলছে। যে যেভাবে পারছে– যতখানি পারছে জাতীয় সম্পদ লুটছে। অফিস-আদালতে যেখানেই যান না কেন ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হচ্ছে না। কোনো কাজ আপনি পাবেন না। বলতে গেলে এক ধরনের শোষণ চলছে সমাজে। যে কাজ স্বাভাবিকভাবে হবার কথা ছিল, সেটা হচ্ছে না; অর্থাৎ আপনাকে আপনার হক থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। দুর্বলের ওপর চলছে নির্যাতন, চলছে নিষ্পেষণ। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই চলছে দিন ও রাতে। মারামারি, কাটাকাটি, খুন-খারাবি– কী নেই এখানে? জীবনের নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই এ সমাজে। কে, কখন কাকে মেরে দেবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ হলো আমাদের সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এ অবস্থায় কোনো জাতি কি দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে পারে? আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এভাবে যদি চলতে থাকে, কেউ যদি এর হাল না ধরে তবে এ অঞ্চলের মুসলমানদের জীবনে অনেক দুর্দশা নেমে আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদের কাছে দেশের নিকট অতীত ও বর্তমান অবস্থার একটা চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয়, আমাদের কী প্রাপ্য ছিল, কী আমরা পাইনি, কোন্ কোন্ দিক দিয়ে আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে, কী কীভাবে আমাদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে এ সব খোলামেলা বলেছি। আমি আশা করি, দেশের সকল চিন্তাশীল নাগরিক, সচেতন ব্যক্তি এ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবেন এবং নিজেদের করণীয় সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কারণ দেশের প্রতিটি নাগরিক ও মুসলমান হিসেবে এটা আমাদের দ্বীনি দায়িত্ব এবং সার্বিকভাবে এটা কর্তব্য বলেও আমি মনে করি।

এ পর্যায়ে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন দেশবাসীর সামনে কিছু কথা রাখতে চায়। তা হচ্ছে– আমি প্রথমে যেমন বলেছি, এ জাতির জন্য একটি আদর্শের প্রয়োজন, স্বাধীনতার পর থেকে এ জাতি কোনো আদর্শ পায়নি, আদর্শের বিকৃতি পেয়েছে, আদর্শের নির্যাতন পেয়েছে, আদর্শের অত্যাচার পেয়েছে। আদর্শ নামক সমাজতন্ত্রের চরম জুলুম এদেশের মানুষকে সইতে হয়েছে। কারণ সমাজতন্ত্র আদতেই কোনো কল্যাণকর আদর্শ নয়। অনুরূপভাবে আর্থিক উন্নয়নের নামে পুঁজিবাদের লুণ্ঠন পেয়েছে; কারণ পুঁজিবাদ তৈরিই হয়েছে মানুষকে লুণ্ঠন করার জন্য। আসলে আমরা যে মুসলমান, আমাদের মধ্যে এ চেতনার জাগরণটা খুবই দরকার। আমরা যে কালেমা লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহর প্রতি ঈমানদার এটা আমাদের কী করতে বলে? এ কালেমা কিন্তু একটি আদর্শের কথা বলে– একটি আদর্শের পথনির্দেশ করে– সেটা হলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান পালন করা। একমাত্র আল্লাহর সামনে মাথা নত করা এবং তাঁরই আনুগত্য স্বীকারের মাধ্যমে তাঁরই দাসত্ব স্বীকার করে নেয়া–অন্য কারো নয়। তাই যদি হয়, তা হলে আমাদের উপরে মানুষের মনগড়া যে সব আইন-কানুন চালু আছে– সেগুলোকে কী করতে হবে? সেগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে এবং তদস্থলে কালেমা অনুযায়ী আইন-কানুন চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা যদি তা না পারি তবে যেভাবে চলছে সেভাবেই চলতে থাকবে– এর থেকে আর পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। ফলে মুসলমান হয়েও আমরা মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে পারব না।

আমি আপনাদের সকলের প্রতি আহ্বান জানাবো, আসুন! আমরা ইসলামকেই আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি, আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করি– নিছক ধর্ম হিসেবে নয়। আমরা ধর্ম হিসেবে তো ইসলাম পালন করি; কিন্তু শুধু ধর্ম হিসেবে তো ইসলাম আসেনি। ইসলাম এসেছে এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে। তাই পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হিসেবেই তা মুসলমানদের নিকট গৃহীত হওয়া দরকার এবং মুসলিম জাতির জীবনকে সর্বতোভাবে সে অনুযায়ী গড়ে তোলা দরকার।

ইদানীং জনগণের মাঝে ওয়াজ-নসিহত খুব হচ্ছে, তাবলীগের কাজও হচ্ছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার চেতনাটা একেবারে মরে গেছে। মুসলমান হিসেবে আমরা যে অন্য কোনো দ্বীন-আদর্শকে গ্রহণ করতে পারি না, অন্য কোনো আইন-শাসনকে মেনে নিতে পারি না; কোনো মানুষের প্রভুত্ব-কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে পারি না এক আল্লাহ ছাড়া এবং রাসূলে করীম (সা.)-এর নেতৃত্ব ছাড়া অন্য কোনো মানুষের নেতৃত্বকে গ্রহণ করতে পারি না এ কথাটি আজ সকলের মাঝে চেতনা হিসেবে আসা উচিত।

বিগত বছরগুলোতে এদেশে ক্ষমতার যে হাত বদল ঘটেছে তাতে একটি সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে শেখ মুজিবের হাত থেকে খন্দকার মোশতাকের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। তারপর আরেকটি বিপ্লবের ফসল হিসেবে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। পরবর্তীকালে এক ইলেকশনে তিনি প্রেসিডেন্ট

নির্বাচিত হন। তারপর আর এক বিপ্লব তাকে হত্যা করে। তারপর আসেন বিচারপতির সাত্তার সাহেব। নতুন ইলেকশন হলে তিনিও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তারপর তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিল আর এক সামরিক বিপ্লব। এভাবে দেশে একের পর এক ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে; কিন্তু এর সাথে জনগণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অধিকাংশ পরিবর্তন সামরিক বাহিনীর লোকেরাই করেছে। যদি এ রকমই হতে থাকে তাহলে জনগণের কোনো কল্যাণ হবে না। যারাই পরিবর্তন করবে তারা তাদের নিজেদেরই স্বার্থ উদ্ধার করবে, তাদের মনগড়া নীতিই এখানে চালু করবে। ফলে জনগণের স্বার্থ বা বক্তব্য এখানে আর থাকবে না। জনগণ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে, তাদের বলার কিছু থাকবে না? এদেশের অধিকাংশ মানুষের চেতনার প্রতীক যে দ্বীন ইসলাম, তদনুযায়ী দেশ চলবে না, সমাজ চলবে না, রাষ্ট্র চলবে না। এ পরিস্থিতি আর চলতে দেয়া যায় না। এক একজন ক্ষমতায় আসবে আর জাতির উপরে তার নিজস্ব খেয়ালখুশি ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দিয়ে বলবে, সব সুখ-শান্তি আমিই দিতে পারি। অতএব আমি যা বলি সবাইকে তা-ই মানতে হবে, এর বাইরে যাওয়া যাবে না– এও এক ধরনের জুলুম, যা আমাদের ওপর চলছে বছরের পর বছর ধরে।

আজ আমি বাংলাদেশের মুসলিম জনতার কাছে, বিশেষত আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের কাছে আমার জীবনের অভিজ্ঞতাসহ অনেক কথাই ব্যক্ত করেছি। আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, মানুষের মৌলিক অধিকাংশ যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের দিয়েছেন, তা আমরা কতটুকু ভোগ করতে পারছি। যদি না পেরে থাকি, তবে তা কেনো পারছি না সকলের ভেবে দেখা দরকার। আমার যা মৌলিক অধিকার তা থেকে আমাকে বঞ্চিত রাখা কি জুলুম নয়? এই জুলুমবাজদের হাত থেকে বাঁচার পন্থা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। অতএব আল্লাহর দেয়া ইলমের ভিত্তিতে তাঁকে হাজির নাজির জেনে, তাঁর প্রতি পূর্ণ ঈমান এনে আজকে আমাদের পরিস্থিতি বুঝতে হবে– বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এরই মধ্য দিয়ে আমাদের কর্মপন্থা বের করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর কথা হলো ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

যে জাতি তার অবস্থা পরিবর্তনে সচেষ্ট হয় না সে জাতির অবস্থা আল্লাহও পরিবর্তন করেন না। (সূরা রাআদ ঃ ১১)

আল্লাহ তা'আলার এ বক্তব্য অনুযায়ী আমাদের নিজদের অবস্থার পরিবর্তন, সমাজের পরিবর্তন তথা রাষ্ট্রের পরিবর্তন যদি আনতে চাই, তবে তা আমাদের নিজেদের উদ্যোগে করতে হবে, তবেই এখানে পরিবর্তন আসবে; অন্যথায় আসবে না, কেউ তা এনে দেবে না। এ বিষয়টি যতই বিচার-বিশ্লেষণ করবেন আমি জোর করে বলতে পারি, ততই এর যৌক্তিকতা আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হবে। এ জন্যে দেশের মুসলিম জনতাকে জাগ্রত করা, তাদের সচেতন করা ছাড়া আমাদের মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পন্থা-পদ্ধতি নেই।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা ধোঁকাবাজ হতে পারে, প্রতারক হতে পারে, ওয়াদা খেলাপি হতে পারে; কিন্তু সাধারণ মুসলিম জনগণ, যাদের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, তারা ইসলাম ছাড়া কিছুই বোঝে না। তাদের কাছ থেকে ভোট নিতে গেলে কিংবা অন্য কোনো কিছু করতে চাইলে ইসলামের দোহাই দিতেই হবে। পাকিস্তান আমলে ছয় দফার পক্ষে ভোট নেয়া হয়েছিল এই বলে যে, কুরআন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে কোনো আইন পাশ করা হবে না। এটুকু ওয়াদা তাদেরকে দিতে হয়েছে বলেই জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। তারা ইসলামের পক্ষেই আছে, তার বিপক্ষে নয়– এভাবে মানুষকে বোঝাতে হয়েছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামের পক্ষে ছিল না, ইনসাফের পক্ষে ছিল না। যদি থাকত তবে তাদের হাতে যখন ক্ষমতা এসেছিল তখন তারা একটা ইনসাফপূর্ণ, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ দেশবাসীকে উপহার দিতে পারত। কিন্তু এতো রক্তারক্তির পরেও এদেশের জনগণ কী পেল? যে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দেশ স্বাধীন করা হলো সে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি কি এদেশের জনগণের ভাগ্য জুটেছে? বিগত বছরগুলোতে গরিব কি আরও গরিব হয়নি, ধনী কি আরও ধনী হয়নি? কাজেই মানুষের তৈরি কোনো মতবাদ যতো চমকপ্রদই হোক না কেন মানুষকে সুখ দিতে পারে না, স্বস্তি দিতে পারে না। এ কথাটি আজ জাতির সামনে পরিষ্কার হওয়া উচিত।

কর্মীদের প্রতি কিছু উপদেশ

আজকের এ অধিবেশনে আমাদের যে কর্মী ভাইয়েরা উপস্থিত আছেন তাদের প্রতি আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনাদের সর্বপ্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে আজ ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তাদেরকে সাথে নিতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। মনে রাখবেন, এদেশের মুসলমানরা ইসলামের প্রতি অত্যন্ত দরদী, তারা আলেমদেরকে ভালোবাসেন, তাদেরকে যদি বুঝানো যায় তাহলে তারা অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠবেন। আর এ সচেতনতা আনতে হবে আপনাদের নেতৃত্ব দ্বারা। সে নেতৃত্ব শুধু ওয়াজের কিংবা দাওয়াত খাওয়ার নয় অথবা হাত পেতে খয়রাত নেবার নেতৃত্বও নয়। আলেমদের নেতৃত্ব শুধু জানাযা কিংবা ইমামতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এগুলোও করবেন– এ সবেরও দরকার আছে মানুষের সাথে একাত্মতা প্রকাশের জন্য। আপনাদের দাওয়াত করলে যাবেন, দাওয়াতও খেতে হবে; কিন্তু দাওয়াতটা কিসের জন্য? আপনার স্বাদের জিনিসটি ওখানে রান্না হবে এ জন্য, তা যেন না হয়। একজন গরিব মানুষও যদি আপনাকে দাওয়াত করে তবে তার সেখানেও যাবেন; কারণ তার সাথে একাত্মতার প্রয়োজন আছে। তাকে আপনার সঙ্গী করে নিতে হবে, আপনার বন্ধু করে নিতে হবে।

আপনাদেরকে লোকদের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে মিশতে হবে এবং সাথে সাথে তৌহিদের দাওয়াত দিতে হবে। লোকদেরকে বলতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ ও প্রভু নেই। আল্লাহর আইন ছাড়া আর কারো আইন আমরা মানতে পারি না; যদি স্বেচ্ছায় এসব মানব রচিত আইন মানি তবে শিরকের মতো বড় অপরাধ হবে এবং আমাদেরকে মুশরিক হয়ে মরতে হবে। তাই আল্লাহ ছাড়া কারো কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব মানা আমাদের তৌহিদী ঈমানের পরিপন্থী। এতে আমাদের ঈমানের সম্পূর্ণ খেলাপ হয়ে যাবে। তাই আসুন, এগুলোকে পরিহার করি। এভাবে লোকদেরকে জাগ্রত করতে হবে, তাদের সাথে একাত্ম হতে হবে, তাদের আপন জন হতে হবে, তাদের দুঃখের দরদী হতে হবে, বিপদের সাথী হতে হবে, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। তারা যদি বুঝে যে, আপনি তাদেরই একজন সঠিক বন্ধু, তাহলে তারা আপনার কথা শুনবে।

অধিবেশনের শেষ পর্যায় আমি বলতে চাই যে, আমাদেরকে ইসলামী চেতনা-ভিত্তিক “গণঅভ্যুত্থান” ঘটাতে হবে। সে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে জিহাদ ও শাহাদাত এ দু’টি স্তর পার হতে হবে। কিন্তু সেটা আপনি, আমি কিংবা

দশ-বারোটি লোক দ্বারা হবে না। যতদূর সম্ভব গোটা জাতিকে সেদিকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। তার জন্য দরকার একটা চরিত্র। জনগণের সামনে আছে যে, তারা দাওয়াত খায় আর ওয়াজ করে। তারা ভালো-মন্দ বা অন্যায়ের খুব একটা পার্থক্য করে না। এই কিছদিন আগে মাদ্রাসার মুদাররেসিনরা একটা ভালো নমুনা দেখিয়েছেন। যে দিকে বেশি বেনিফিট দেখে তারা সেদিকে দৌড়ায়। এমনকি ফ্যামিলি প্লানিং-এর মতো একটি খারাপ জিনিসকেও তারা হালাল প্রমাণ করতে কসূর করে নি। এর বিরুদ্ধে তারা টু-শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

যা হোক, আজ সকলকে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করতে হবে কাঙ্ক্ষিত সেই গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর লক্ষ্যে। এটা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে করতে হবে। আমার (আবদুর রহীমের) কাছে কিংবা হাফেজ্জী হুজুরের কাছে শপথ নেবার দরকার নেই। আল্লাহর সাথে আপনি নিজে কথা বলুন; কেননা আপনার ঈমান আল্লাহর প্রতি। আপনি তাকেই বলুন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার সৃষ্টিকর্তা, আমার জীবনের লক্ষ্য তোমার দ্বীন কায়েম করা; সেজন্য চেষ্টা করা, জিহাদ করা– প্রয়োজনে শাহাদাত বরণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, এবং এর ওপরে আমাকে কায়েম রেখো। আমি যেন কখনও নিজকে এর থেকে বাইরে না রাখি। হে আল্লাহ! এর ওপর আমাকে অটল থাকতে সাহায্য করো। কুরআন মজীদের ভাষায় এই অঙ্গীকার– এই প্রতিশ্রুতিকে বলা হয় মিসাক্কা– আপনি এই মীসাক্কা করুন আল্লাহর কাছে।" এর সাথে সাথে কিছু প্রক্রিয়াও অবলম্বন করতে হবে যা আমি ইতঃপূর্বে আপনাদের নিকট বলেছি।

এ দেশের মানুষের ইতিহাস আপনারা জানেন। এরা অত্যন্ত নিরীহ ও খুবই সাদাসিধে; এদেরকে সঙ্গে নেয়া অর্থাৎ সংগঠিত করা খুব কঠিন নয়। আপনি যদি বাস্তবিকই তাদের দরদী বলে আস্থা অর্জন করতে পারেন, সেই সঙ্গে আপনি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হন, আপনি তাদের ভুল পথে নিয়ে যাবেন না, আপনি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না; আপনি যা করবেন তাতে তাদের কল্যাণ হবে, এ ধরনের বিশ্বাস যদি আপনার প্রতি জন্মে তবে নিশ্চয়ই জনগণ আপনার সাথে আসবে। মনে রাখবেন, আমাদের লক্ষ্য হবে দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরি কায়েম করা এবং পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন– এছাড়া আর কিছু নয়।

আর একটি বিশেষ প্রসঙ্গে নিয়ে আমি আপনাদের কিছু কথা বলতে চাই। তা হচ্ছে ইদানীং ইসলামী আন্দোলনের মধ্যেও নেতৃত্বের একটা মোহ জন্মেছে। কিছু লোক কাজের চেয়ে নেতৃত্ব নিয়েই বেশি মাথা ঘামাচ্ছে। এটা ঠিক নয়; এতে যে কোনো সংগঠনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নেতৃত্ব যদি কোনো এক পর্যায়ে এসে যায় সেটা ভিন্ন কথা; কিন্তু নিজকে কেউ নেতা বানানোর প্রতিযোগিতায় কখনও লিপ্ত হবেন না। এরূপ কাজের অর্থ হলো যে, আপনি ইসলামকে প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আপনার স্থান কোথায় এটা নির্ধারণ করবেন আল্লাহ– আপনি নিজে করবেন না। আপনাদের প্রতি অনুরোধ যে কাজই করবেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবেন। এভাবে নিয়তকে খালেস করে আপনাদের কাজ করতে হবে।

এ দেশে যারাই আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চায়, আজ হোক, কাল হোক কোনো না কোনো সময়ে তাদেরকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে পারব ইনশাআল্লাহ; এ বিশ্বাস আমার আছে। আর সঠিক আওয়াজ যদি বুলন্দ করা যায়, এদেশের উলামায়ে কেরামও আপনাদের সাথে থাকবে। কেননা এমন এক দাওয়াত– এমন এক আহ্বান– যে আহ্বানকে কোনো ঈমানদার ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না। আল্লাহর এ দ্বীন আল্লাহর এ জমিনে কায়েম হবে নয় তো কার দ্বীন কায়েম হবে? এখানে মানুষের রচিত মনগড়া মতবাদ কায়েম হবে আর আমরা চুপচাপ বসে থাকব আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি করে? আমাদের মধ্যে যদি বাস্তবিকই ঈমান থেকে থাকে তবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হবে। নানা দলের নানা দফা আমরা বুঝি না। আমরা বুঝি এক দফা– ইন্নাদদ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু আমরা বুঝি না। আমরা জানি, একই বিধান একই হুকুম– ইনিল হুকমু ইল্লালিল্লাহ আমারা আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়্যাহু। আমরা জানি, এক নেতা– মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ছাড়া আর কাউকে নেতা হিসেবে মানি না। তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলো, বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং চিরস্থায়ীভাবে যারা ক্ষমতায় বসার জন্য ব্যস্ত তাদের কারোর হুকুম মানুষের ওপর চলতে পারে না– চলতে দেয়া যায় না।

অবশ্য ক্ষমতা এমনই এক মোহ যে, একবার কেউ ওখানে গেলে সহজে আর ছেড়ে দিতে চায় না– যতক্ষণ না তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া

হয়। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। ১৯৫৮ সনে সামরিক শাসনকালের কথা, প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খান। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ছিল তখন পাকিস্তানের ভাগ্যনিয়ন্তা। মার্শল 'ল' দিয়ে সব ক্ষমতা মির্জা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়েছিল। ইস্কান্দার মির্জার স্ত্রী নাহিদ মির্জা একদিন বিকেলবেলা মহিলাদের এক বিরাট সভা ডেকে বললেন, আমাদের অন্তত দশ বছরের জন্য ক্ষমতায় থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এ উপলক্ষে তারা একটা পার্টি দিল। সেখানে গান-বাজনা আর আনন্দ-ফূর্তি করে সবাই বাড়িতে গিয়ে উঠল। রাত বারোটার পরে আইয়ুব খান, আজম খান ও বার্কীসহ আরও তিন-চারজনকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, যান, মির্জা সাহেবকে গিয়ে বলুন, আজ রাতেই তাকে দেশ ত্যাগ করতে হবে; আজই তার ক্ষমতা শেষ। এমনই নিদর্শন আমাদের সামনে আরো বহু রয়েছে।

তাই আমরা চাই, আমাদের ওপর যে গায়রুল্লাহ্‌র হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তা না নিস্তনাবুদ হয়ে যাক। আমরা সকলে যেন অ-খোদার শাসন থেকে, তাদের গোলামী থেকে মুক্ত হই এবং কেবল আল্লাহর গোলাম হয়ে দুনিয়ায় জীবন-যাপন করি।

আলেমদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

আপনারা যারা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছেন বা শেষ পর্যায়ে রয়েছেন তাদের প্রতি আমার কিছু উপদেশ থাকবে। সেটা হলো, আপনাদের ইলম হাসিল করতে হবে প্রধানত কুরআন ও হাদিস থেকে। রাসূলে করীম (সা.)-এর সীরাত হলো কুরআন মজীদের বাস্তব রূপ; তাই তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বুঝতে হবে। অন্যদিকে বাংলা ভাষা সম্পর্কে আপনাদের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা মাদ্রাসার ছাত্রদের একটি দুর্নাম আছে যে, তারা ভালো বাংলা জানে না। অথচ বাংলা ভাষা হলো আমাদের প্রকাশ মাধ্যম– আমাদের মাতৃভাষা; বক্তৃতা করার জন্যও ভালো বাংলা জানতে হয়। ভুল বাংলায় বললে লোকেরা হাসবে ও বলবে, মোল্লা কিছুই জানে না– বাংলা ভাষাটাও ভালো করে বলতে পারে না।

উপরন্তু যাদের মাঝে লেখালেখির প্রতিভা আছে তারা লিখতে চেষ্টা করবেন। লেখার মাধ্যমে আপনারা ইসলামের খিদমত করতে পারেন। এভাবে মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো সহজ হবে। তবে সেজন্য সাহিত্যিক মানের বাংলা ভাষা আপনাকে জানতে হবে। আসলে এ সব কিছুই অর্জন করার জিনিস। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করলে ও সাধনা করলে আপনারা এটা অর্জন করতে পারবেন। সেজন্য মূল কুরআন ও হাদীসকে সামনে রেখে সর্বমুখী পড়াশুনা করা দরকার। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান না জানা কিন্তু আলেম সমাজের একটা বিরাট কলঙ্ক; এ কলঙ্ক থেকে তাদের মুক্ত হতে হবে।

আজকের এ দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে যে জিনিসটি আমি বোঝাতে চাচ্ছি, তা হচ্ছে ঃ আমরা মুসলমান– ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী; কিন্তু সে অনুযায়ী আমাদের কোনো কিছুই চলছে না। অর্থাৎ আমাদের যা হক, আমাদের যা পাওনা, তা আমাদের দেয়া হচ্ছে না। কে বা কারা আমাদের দিচ্ছে না? যারা বছরের পর বছর ধরে ক্ষমতা ভোগ করছে তারা দিচ্ছে না। তাই এটা জুলুম। এ জুলুম থেকে এ দেশবাসী এবং আমাদের নিজদেরকে বাঁচাতে হবে। বছরের পর বছর ধরে আমাদের হক থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে; এভাবে চলতে দেয়া যায় না। তাই আমাদের বক্তব্য হলো আমাদের হক নিজেদেরই আদায় করে নিতে হবে। সেজন্য এ বাংলাদেশের জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে সমস্ত ভয়-ভীতির উর্ধ্বে উঠে কাজ করে যেতে হবে। কেবল আল্লাহকে ভয় করে– পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এই ঈমান রেখে এ জমিনে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে।

আমরা এদেশের আলেম সমাজ বলতে গেলে খুবই গরিব লোক। তেমনি আমরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতও নই। বেশি চালাকি, বেশি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা ধন-সম্পদ আমাদের নেই। তাই বোধ হয় অনেক কিছু আমরা করতে পারি না। কিন্তু একটি জিনিস তো নিশ্চয়ই আমাদের আছে; সেটা হলো আমাদের এ জীবনটা। এ জীবনটা দিয়েও তো আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করতে পারি। এ সিদ্ধান্তে যদি আমাদের শাহাদাতের প্রশ্ন আসে তবে তার জন্য তৈরি থাকতে হবে। কেননা ইসলামের সাফল্যের জন্য শাহাদাত একটি অনিবার্য পর্যায়। ইসলামের গোটা ইতিহাসই শাহাদাতের ঘটনায় ভরপুর কাজেই যার তকদিরে আল্লাহ তা'আলা শাহাদাতের মর্যাদা লিখেছেন তিনি শহীদ হয়ে

যাবেন। ইরানের ইসলামী বিপ্লবে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছাতে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে– অনেক জীবন বিলিয়ে দিতে হয়েছে। সে কারণে সাফল্য এসেছে, সে ইতিহাস আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। সেই ইতিহাস আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

ভয় কাউকে করার দরকার নেই– এক আল্লাহ ছাড়া। জেল-ফাঁসি কোনো কিছুকেই ভয় করার দরকার নেই। মনে রাখবেন, আল্লাহর সামনে এরা একটা পিঁপড়ার চাইতেও অক্ষম। কাজেই আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাব, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের ব্যাপারে একেবারে নির্ভীক হয়ে– ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে বাংলার জমিনে দ্বীনের ঝাণ্ডা উত্তোলনের জন্য নির্ভীক চিত্তে কাজ করে যান। আল্লাহ অবশ্যই মজলুম ও মাহরুমদের সাথে থাকবেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে তার দ্বীনের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন।

টীকা

১. এরপর ১৯৮৬, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সনেও নির্বাচন হয়েছে, যার পরিণতিতে দেশের সার্বিক অবস্থা প্রায় একই রূপ রয়েছে। ক্ষমতার হাত বদল ছাড়া দেশে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি।

২. প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র লিখেছেন : স্কুলের মাঠে বাঙালি ও মুসলমানে ফুটবল ম্যাচ (শ্রীকান্ত, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)। এ বক্তব্য দ্বারা তিনি যে 'বাঙালি' দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়কেই বুঝিয়েছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৩. এ বক্তব্যটা রাখা হয়েছে এরশাদের স্বৈর-শাসনকালে। এর পরবর্তীকালেও প্রায় একই পরিস্থিতি চলে আসছে পূর্ববর্তী ধারা বহাল থাকার কারণে।

৪ স্মর্তব্য যে, এ কথাটি বলা হয়েছে আশির দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে। – সম্পাদক

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৮৫/১-এ (৪র্থ তলা), পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম [রহ.]

প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদই কাম্য

প্রচলিত রাজনীতি নয়

জিহাদই কাম্য

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.)



প্রকাশনায়

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ একটি সমস্যা ভারাক্রান্ত দেশ। এদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষানীতি অজস্র সমস্যার কশাঘাতে জর্জরিত। এ সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কোন পথে– প্রচলিত রাজনীতিতে, না অন্য কোনো উপায়ে এ প্রশ্নগুলো অনেক দিন ধরেই দেশের চিন্তাশীল লোকদের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছে। ধর্মহীন বা সেক্যুলার রাজনীতির প্রবক্তারা প্রচলিত রাজনীতিকেই দেশের সব রোগ-ব্যাধির একমাত্র দাওয়ারূপে গণ্য করতে চাইছেন। তারা গণতন্ত্রের নামাবলী পরে দিন-রাত গলাবাজি করছেন, মাঠ-ঘাট গরম করে তুলছেন; কিন্তু প্রচলিত রাজনীতি এদেশের পুঞ্জীভূত সমস্যাবলির কতটা সমাধান করতে পেরেছে? গণতন্ত্রের গলাবাজিই বা এদেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে কতটা সক্ষম হয়েছে এ প্রশ্নটি কেউ খতিয়ে দেখার প্রয়োজনবোধ করছেন না। তাই একটি জননির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় বসার পরও রাজনৈতিক বিতর্কের অবসান ঘটছে না এদেশে।

এ ভূখণ্ডে ইসলামী আন্দোলনের মহান স্থপতি এবং ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর

রহীম (রহ) প্রচলিত রাজনীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে এক চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করেছেন বর্তমান পুস্তিকায়। তিনি অকাট্য যুক্তি-তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, প্রচলিত রাজনীতিতে এ দেশের কোনো সমস্যার এতটুক সমাধান হতে পারে না। এর মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজও অগ্রসর করা সম্ভবপর নয়। মূলত এ রাজনীতি হচ্ছে পাশ্চাত্যের কুফরী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-বিশ্বাসের অনিবার্য ফসল। এর সাহায্যে মুসলিম জাতির কোনো রোগ-ব্যাধির নিরাময় হতে পারে না; সেটা হতে পারে কেবল আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত জিহাদী তরিকায়, ইসলামী জনতার ঐক্যবদ্ধ সর্বাত্মক প্রচেষ্টায়। কাজেই প্রচলিত রাজনীতির মোহ ত্যাগ করে এ তরিকায় এ প্রচেষ্টায়ই শামিল হওয়া উচিত বাংলাদেশের গোটা ইসলামী জনতার। এটাই তাদের মুক্তি ও আজাদীর রাজপথ।

পুস্তিকাটি ১৯৮৫ সালে এরশাদের সামরিক শাসনের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এর মূল প্রতিপাদ্য এখনও পুরোপুরি অক্ষুন্ন রয়েছে। পুস্তিকাটি বাংলাদেশের সত্য সন্ধানী জনতার কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই এর একাদশ সংস্করণ বের করতে হয়েছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করছি।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
সাবেক চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম (রহ.) রিচার্স ফাউন্ডেশন

প্রারম্ভ কথা

‘প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদই কাম্য’ এ পর্যায়ে আমার এ আলোচনা নেহাত কোনো তাত্ত্বিক বক্তব্য নয়। দেশের সমসাময়িক অবস্থার সাথে সাধারণভাবে এবং ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত লোকদের মানসিক জিজ্ঞাসার সাথে বিশেষভাবে এর সম্পর্ক রয়েছে। দেশের বর্তমান (১৯৮৫) অবস্থার সাথে আমাদের তৎপরতা সামঞ্জস্যশীল কি না এবং দেশে প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার সাথে আমাদের সম্পর্ক কী, সংশ্লিষ্ট সকলের মনে জেগে উঠা এ একটি জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসার জবাব একান্তই প্রয়োজন।

আমি এ পর্যায়ে একটু বিশদ আলোচনা পেশ করার প্রয়োজন মনে করছি- যেন আমাদের কাফেলায় শামিল লোকেরা তাদের মনের প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব জানতে পারেন। ভবিষ্যতের দিকে চলার পথনির্দেশ লাভ করতে পারেন এবং তাদের সম্মুখে আপন জীবন-লক্ষ্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠে। আর সেই সাথে দেশবাসীও রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস ও তৎপরতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সমর্থ হয়।

বর্তমানে দেশে যে রাজনীতি চলছে, সকলেই জানেন, আমরা সে

রাজনীতিতে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। দেশের পরিচিত রাজনৈতিক দল, জোট ও গোষ্ঠীগুলো যা যা বলছে ও করছে আমরা তা বলছি না, করছিও না। আমাদের কথা ও কাজ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ধারাপ্রবাহের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্নতর। রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ যে সব মৌলিক সমস্যার কথা বলে, আমরা সেগুলোকে আদৌ মৌলিক সমস্যা মনে করি না। তারা সমস্যাবলির যে সমাধান পেশ করে আমরা তাকে আদৌ সমাধান মনে করি না; বরং আমাদের দৃষ্টিতে দেশ ও জাতির প্রকৃত সমস্যার দিকে তাদের আদৌ দৃষ্টি নেই। তা তাদের চোখেও পড়ে না। তাদের পেশকৃত সমাধান বরং আমাদের দৃষ্টিতে নতুন করে সমস্যা সৃষ্টিরই নামান্তর। শুধু তাই নয়, সমাধানের নামে তারা যে জিনিস জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করছে, তা পুরাতন সমস্যারই পুনরাবৃত্তি। সে সমাধান জাতির প্রকৃত মুক্তির পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে; বরং আজ প্রকৃত সমস্যার সমাধান যত সহজ, তাদের উপস্থাপিত সমাধান তাকে তত বেশি কঠিন ও দুঃসাধ্য বানিয়ে দিতে পারে। তাই এ ব্যাপারে আমরা তাদের সাথে কিছুমাত্রও একমত নই।

দেশের বর্তমান সার্বিক অবস্থা

দেশের বর্তমান[১] সার্বিক অবস্থা হচ্ছে, প্রায় চারটি বছর ধরে দেশে সর্বাত্মক সামরিক শাসন চলছে। সামরিক শাসন জনপ্রতিনিধি নয়- জনগণের একবিন্দু আস্থাভাজনও নয়- এমন এক ব্যক্তির নিরংকুশ ও স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন। এখানে সর্বময় কর্তৃত্ব এক ব্যক্তির কুক্ষিগত। সে একাই স্বাধীন। দেশের জনগণের না কিছু ভাববার বা বলবার অধিকার আছে, না আছে সেই এক ব্যক্তির মতের বিরুদ্ধে কিছু করার একবিন্দু অধিকার। সকল নাগরিক সেই এক ব্যক্তির নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধীন, অধিকার বঞ্চিত নিকৃষ্ট গোলাম। কে 'ভালো' কে 'মন্দ' বললে তা-ই মন্দ হয়ে যায় আর মন্দকে ভালো বললে তাই সকলকে ভালো জেনে গ্রহণ করতে হয়। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও চিরন্তন শাশ্বত আদর্শের ভিত্তিতে কোনটা প্রকৃত ভালো আর কোনটা প্রকৃত মন্দ তা বলার বা প্রচার করার অধিকার

কারো নেই।[২] মানবতার জন্য এর চাইতে অধিক লাঞ্ছনা ও অবমাননা আর কী হতে পারে।

বর্তমানে (১৯৮৫) দেশের জনজীবন সর্বদিক দিয়েই অসম্ভব, দুঃসহ ও কঠিনতম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে জীবন ও মান-ইজ্জতের কোনো নিশ্চয়তা নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য একেবারে লাগামহীন, নিয়ন্ত্রণহীন, জনগণের ক্রয়ক্ষমতার অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। প্রশাসন ও বিচার বিকেন্দ্রীকরণের[৩] নামে বিচারকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করা হয়েছে; যে যত বেশি মূল্য দিতে পারে, বিচারকে সে তত নিজের পক্ষে ক্রয় করতে পারে। ঘুষ-রিশওয়াতের রাজত্বকে উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসন থেকে শুরু করে গ্রাম-পল্লী এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেয়া হয়েছে। গ্রামের টাউট, চোর-ডাকাতের দাপটে নিরীহ জনগণ ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। জীবনের স্বস্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রশাসন কার্যত 'দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন'-এর কাজ করে যাচ্ছে।

এখানে সাধারণ মানুষ তথা মানব-বংশের কোনো মূল্য বা মর্যাদা নেই। মানব বংশের অপ্রতিরোধ্য বৃদ্ধিতে সর্বময় কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি নিজেকে রিযিকদাতা মনে করে সাংঘাতিকভাবে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। কুকুর বা গরু-ছাগলের বংশ বৃদ্ধিতে তার কোনো আপত্তি নেই। তাই বিশ্ব ইয়াহুদী সংস্থাসমূহের ঋণ বা 'সাহায্য' বাবদ দেয়া কোটি কোটি টাকা অকাতরে ও বিনা হিসাবে উড়ানো হচ্ছে মানব-বংশের অব্যাহত বৃদ্ধির প্রবাহকে রুদ্ধ করার জন্য, যা মূলত কুরআন-সুন্নাহ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যার ব্যর্থতা একান্তভাবে অনিবার্য অবধারিত।

দেশে প্রকৃত জনমতের এক কানাকড়িও মূল্য নেই। প্রকৃত জনমত প্রকাশের সকল পথই কার্যত বন্ধ।[৪] গণভোট বা উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রহসন দেখিয়ে জনমতের মূল্য ও নাগরিকদের মর্যাদার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয়েছে। তথাকথিত এ নির্বাচনে প্রকৃত ভোটদাতারা ভোট কেন্দ্রে না গেলেও তাদের ভোট অদেয় থাকেনি এবং এভাবে না-দেয়া ভোটকে দেয়া গণ্য করে শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি ভোট পেয়ে আস্থালাভ বা নির্বাচিত হবার সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন গৌরব প্রচার করে বেড়ানো হচ্ছে।[৫] বিশ্ব সাংবাদিক মহল এ ভোটাভুটির ভিত্তিহীনতা ও

কৃত্রিমতা প্রত্যক্ষ করলেও উক্ত গৌরব প্রকাশে একবিন্দু লজ্জাও বোধ করা হয় না। এই কৃত্রিমতা ও তার ওপর এহেন নির্লজ্জতা এ জাতির জন্য এক দূরপনেয় কলংক, সন্দেহ নেই।

জাতীয় সম্পদের বিরাট অংশ কর্তাব্যক্তি ও তার চাটুকাররাই নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছে। এখানে জাতীয় সম্পদ যে যত বেশি মেরে দিতে পারে, সে তত বেশি যোগ্য বলে বিবেচিত হয় এবং তার পদোন্নতি তত বেশি নিশ্চিত হয়। যারা তা পারে না বা নীতিগতভাবেই করতে চায় না, তারা উপেক্ষিত- পদোন্নতির ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকেও বঞ্চিত।

এ জাতির কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ নেই। নেই এর কোনো দিক-নির্দেশনা। এ জাতির কার্যক্রম অপরিকল্পিত লক্ষ্যহীন, নিরুদ্দিষ্ট। আর শাশ্বত কথা হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও দিক-নির্দেশনা ছাড়া কোনো জাতির অস্তিত্ব অসম্ভব; সে জাতির কোনোরূপ উন্নয়নও কল্পনাতীত।

প্রতিবেশী দেশের পণ্যে বাজার ছেয়ে গেছে বলে এদেশের পণ্যের কোনো চাহিদা নেই- বিক্রয় নেই। তাই কল-কারখানাসমূহ অচল।

এ জাতি এখনও বাস্তবভাবে স্বাধীন নয়। কারণ এদেশে আইন-কানুন, শাসন পদ্ধতি ও জাতীয় জীবনের রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি এখনও ঠিক তাই কার্যকর যা এই গোলাম দেশকে গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য ইংরেজরা চালু করেছিল। এর জীবন-দর্শন, জীবন-লক্ষ্য, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি ও প্রশাসন-পদ্ধতি এখনও পুরাপুরিভাবে এবং কোনোরূপ পার্থক্য ব্যতিরেকে ঠিক তা-ই, যা এই গোলাম দেশের জনগণকে গোলাম করে রাখার উপযোগী করে বৃটিশরা চালু করে গেছে। বিগত আটত্রিশ[৬] বছরেও তাতে একবিন্দু পরিবর্তন সূচিত হয়নি। তাই আমি নির্দ্বিধায় বলছি যে, "আমরা দু'-দু' বার স্বাধীন হয়েও একান্তই পরাধীন হয়ে আছি।" আমরা নিজেদেরকে যতই স্বাধীন বলে দাবি করি না কেন, সে দাবির অন্তঃসারশূন্যতা অত্যন্ত প্রকট ও অনস্বীকার্য। স্বাধীন জাতির কোনো বৈশিষ্ট্যই আজ আমাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রচলিত রাজনীতি

রাজনীতির সাথে রাষ্ট্র সম্পর্কিত রীতিনীতি, নিয়ম-পদ্ধতি, আইন-কানুন ও আদর্শের সম্পর্ক ওতপ্রোত। আর রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বাত্মক-সর্বগ্রাসী। তাই রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আমাদের সামগ্রিক জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের সাথে অত্যন্ত গভীর। তাই এদেশে বর্তমানে যে রাজনীতি চলছে, সে রাজনীতি নিয়ে দেশের রাজনৈতিক দল ও দলসমূহের জোটগুলো কঠিনভাবে ব্যতিব্যস্ত। সে রাজনীতি দেশের সার্বিক অবস্থার সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তার দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রকৃত সমস্যার সত্যিই কোনো সমাধান হওয়া সম্ভব কি না এবং আমরাই বা এ রাজনীতির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত কেন, তার যৌক্তিকতা কী, বিস্তারিতভাবে এ সবের বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। অতঃপর এ পর্যায়ে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

প্রচলিত রাজনীতির মূল্যায়ন

প্রচলিত রাজনীতির ব্যাপক মূল্যায়ন পর্যায়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে ঃ

১. দেশে বর্তমানে যে রাজনীতি চলছে, প্রথমত তা গোলামীর প্রতীক। এদেশ যে অতীতে পরাধীন ছিল এবং এখনও কিছুমাত্র স্বাধীনতার বিশেষত্ব লাভ করতে পারেনি, তার বাস্তব ও অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে দেশের প্রচলিত রাজনীতি। এ রাজনীতি হুবহু তা-ই, যা ইংরেজ এ দেশের 'হর্তাকর্তা-বিধাতা' থাকাকালে চালু করেছিল অধীন দেশের জনগণকে গোলাম বানিয়ে রেখে শাসন ও শোষণ করার জন্য, গোলাম উপযোগী রাজনীতি হিসাবে।

সকলেরই জানা কথা, উপমহাদেশে যখন স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্রতর হয়ে উঠেছিল, তখন ইংরেজরা মনে করেছিল এদেশে এমন এক ধরনের রাজনীতি চালু করা এবং রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ করে দেয়া আবশ্যক, যা পেয়ে এদেশের জনগণ পরাধীন থেকেও নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করতে পারবে; এমন এক

রাজনৈতিক ঘোরপ্যাঁচে তাদেরকে জড়িয়ে দেয়া দরকার, যার জটাজালে বন্দী থেকেও তারা মনে করবে- আমরা স্বাধীনতা পেয়ে গেছি, আমরা আমাদের নেতা নির্বাচন করে তাদের দ্বারা শাসিত হওয়া এবং তাদের মাধ্যমে বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা ও চাকরি লাভের উপায় খুঁজে পাচ্ছি; সর্বোপরি তা হবে এমন এক রাজনীতি, যার মধ্যে লিপ্ত থেকে জনগণের প্রকৃত আস্থাভাজন, তাদের প্রকৃত কল্যাণকামী, সত্যদর্শী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা নির্বাচিত হতে, জনগণের নেতৃত্ব দিতে এবং তাদের জাতীয় আদর্শ বাস্তবায়নে কখনই সক্ষম হবে না।

এ উদ্দেশ্যেই ইংরেজ সরকার ১৯৩৫ সনে ভারত শাসন আইন জারি করে। এই আইনের ভিত্তিতে কেবল প্রাদেশিক পরিষদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নির্বাচনে বিশেষ পরিমাণের করদাতাদের ভোট দানের সুযোগ দেয়া হয়। যদিও দেশের সার্বভৌমত্ব তখন বৃটিশ সরকারেরই কুক্ষিগত এবং সমগ্র উপমহাদেশের উপর বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বড়লাটেরই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার্যকর ছিল। সর্বোপরি তখন উপমহাদেশ ভিত্তিক কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচনেরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

প্রদেশভিত্তিক পরিষদ গঠনের জন্য ১৯৩৬ সনেই সর্বপ্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও দেশের বিশেষ পরিমাণের করদাতা ব্যক্তিরা তাতে ভোট দেয়ার সুযোগ লাভ করে। এতে বিভিন্ন দল টিকেট (মনোনয়ন) দিয়ে নিজেদের দলীয় সদস্যদেরকে ভোট প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়, তাদের জয়ী করার জন্য দলের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় এবং দলীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে প্রার্থীর পক্ষে ব্যাপক ক্যানভাস করানো হয়। বৃটিশ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে এ রাজনীতিরই উত্তরাধিকার লাভ করে। গণতন্ত্রের নামে এ রাজনীতিই এখন চলছে দেশে। নানা মত ও পথের রাজনৈতিক দল গঠন, নির্বাচনে দলের প্রার্থী দাঁড় করানো, তার সাফল্যের জন্য দলের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ, স্বেচ্ছাসেবী (ভলান্টিয়ার) বাহিনী পাঠিয়ে ক্যানভাস করানো, টাকা দিয়ে ভোট ক্রয়- এই হলো বর্তমান গণতান্ত্রিক রাজনীতির সারকথা।

এ দৃষ্টিতে তখনকার ও বর্তমান রাজনীতির বিচার-বিবেচনা করা হলে এ দুয়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব কাজের দিক দিয়ে কোনো মৌলিক পার্থক্যই লক্ষ্যগোচর হবে না। তখন প্রার্থী ভোটদাতাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোট চাইত, এখনও চায়। তখন প্রার্থী জনগণের হাতে আকাশের চাঁদ তুলে দেয়ার ওয়াদা করত, এখনও করে। তখন দলের টিকেট নিয়ে প্রার্থী দাঁড়াতো, এখনও দাঁড়ায়। তখন দলীয় প্রার্থীর পক্ষে দলের তরফ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হতো, এখনও করা হয়। তখন দলীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য কাজ করত, এখনও তা-ই করে। তখন দেখা হতো না প্রকৃত সার্বভৌমত্ব কার হাতে এবং প্রার্থীর বাস্তবিকই কিছু করার ক্ষমতা আছে কি না। এখনও তা দেখা হয় না। তখন জনগণকে মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে ভোলানো হতো, এখনও ভোলানো হয়। তখন নগদ টাকা দিয়ে ভোট কেনা হতো, এখনও তা হয় । তখন যেমন জাল ভোট দেয়া হতো, ভোট বাক্স ছিনতাই হতো, এখনও তা হয়; বরং এখন তা হয় আগের তুলনায় অনেক অনেক বেশি- যাকে ব্যালট ডাকাতি বলাই অধিকতর শোভন, তার রূপ বা ধরন যাই হোক না কেন! তখনো নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদ সদস্যরা জনগণের কল্যাণে কিছুই করতে পারত না, এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারে না। কাজেই পরাধীনতার আমলের রাজনীতি ও স্বাধীনতার আমলের রাজনীতি অভিন্ন ও একাকার; এ দুয়ের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। আমার মতে দেশের প্রচলিত রাজনীতি পরাধীনতার প্রতীকই শুধু নয়, পরাধীনতার চরিত্রকে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব দানকারীও। আর এজন্যই আমরা এ রাজনীতির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কেননা আমরা প্রকৃত স্বাধীনতার পক্ষে। পরাধীনতার সমস্ত চিহ্নকে চিরতরে মুছে ফেলাই আমাদের ঈমানের ঐকান্তিক দাবি।

২. দেশের প্রচলিত রাজনীতি যেমন পরাধীনতার চরিত্র সৃষ্টিকারী তেমনি তা ধর্মনিরপেক্ষতাভিত্তিক। ধর্মনিরপেক্ষতা- ইংরেজী পরিভাষায় যার নাম সেকিউলারিজম (Secularism)[৭] । সেকিউলারিজম হচ্ছে, খ্রিস্টান ইউরোপে সৃষ্ট একটি বিশেষ ধরনের মতাদর্শ। এটি বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার ফসল। এতে শুধু বৈষয়িক ব্যাপারাদিই বিবেচনা ও গুরুত্ব লাভের অধিকারী। মানুষ যে এ জগতে এক বিশেষ ও

মহান মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি, তা এতে স্বীকৃত নয়; বরং মানুষকে মনে করা হয় জন্তু-জানোয়ারেরই অধঃস্তন বংশধর। জন্তু-জানোয়ারের যেমন কোনো নৈতিকতা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বা হালাল-হারামের বিবেচনা নেই, এই মত অনুসারে মানুষেরও তা থাকবে না। এতে যদিও ধর্মবিশ্বাস পোষণের ব্যক্তিগত সুযোগ আছে; কিন্তু তা ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের কিছু ধরা-বাঁধা আনুষ্ঠানাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না, কোনো প্রভাব চালানো যাবে না, দোহাই দেয়া চলবে না। ফলে পশুর ন্যায় ধর্মহীন জীবনকেই মনে করতে হয় মানুষের ললাট লিখন। কিন্তু আমরা এ চিন্তাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অসত্য, অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক মনে করি । তাই সেকিউলার রাজনীতিতে আমাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেখানে আমাদের উপস্থিতিকেও আমরা শাশ্বত ঈমানের পরিপন্থী মনে করি।

৩. বর্তমানে (১৯৮৫) দেশে যে রাজনীতি চলছে স্পষ্টতর ভাষায় বললে তা হচ্ছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের রাজনীতি। অন্যকথায়, এ দেশে পূর্বে গণতন্ত্র কার্যকর ছিল, বর্তমানে এই সামরিক শাসনের আমলে সে গণতন্ত্র নেই।[৮] অতএব, তা পুনরুদ্ধার করতে হবে, এ-ই হচ্ছে এখনকার রাজনীতির সারকথা।

একথা ঠিক যে, বর্তমানে সামরিক শাসনে গণতন্ত্র' চালু নেই, অন্যকথায় পূর্বের ন্যায় জনগণ ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদের নির্বাচন করছে না; নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রভাবশালী নেতারা বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত নেই। যদিও এই সামরিক শাসনে অনির্বাচিত এক ব্যক্তির নিরংকুশ শাসন ক্ষমতার অধীনে এক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীও হয়েছে, বিভিন্ন মন্ত্রীত্বে রাজনৈতিক ময়দানের বিভিন্ন দিকপাল ক্ষমতাসীনের ব্যক্তিগত দয়া ও অনুকম্পার দান হিসেবে- সেই ব্যক্তির গুণগান ও বিজয়গাথা প্রচার ও মোসাহেবী করার কাজে নিযুক্তি পাচ্ছে এবং পেয়ে নিজেদেরকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে গণতন্ত্র নেই, একথা সর্ববাদীসম্মত। এমনকি তথাকথিত গণতান্ত্রিক উপায়ে কয়েক কোটি ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে

জাতির মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা টাকায় আলালের ঘরের দুলালের ন্যায় লালিত-পালিত ও বিশেষ ধরনের বেশভূষা ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর প্রধান হওয়ার সুযোগে সিংহাসন থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখলকারী ব্যক্তি বলছেন, দেশে এখন গণতন্ত্র নেই বটে; কিন্তু আমি গণতন্ত্র বিরোধী নই। আমিই গণতন্ত্র দেবো। তবে তা দেয়ার প্রক্রিয়া কী হবে, তা নির্ধারণের জন্য তা দেয়ার পূর্বে আমার সাথে সংলাপে বসতে হবে।

তার অর্থ, গণতন্ত্র এমনই এক চীজ যে, এই মাত্র যে ব্যক্তি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিরচ্ছেদ করল, সেও গণতন্ত্রের বিরোধী নয়, সেও গণতন্ত্র দেবে বলে রস উপচানো সংলাপ চালাতে সদা প্রস্তুত। আর গণতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের লোকেরা গণতন্ত্রের স্বাদ আস্বাদন করতে না পারলেও সংলাপের উপচানো রস আস্বাদনের জন্য বঙ্গভবন দখলকারী ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে হাজিরা দিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে না।

হ্যাঁ, গণতন্ত্র এক আজব চীজই বটে। কেননা তা সরাসরি এসেছে ইংল্যান্ড থেকে। নিশ্চয়ই এটি আমদানি করা এক পরম লোভনীয় বস্তু। ইউরোপেই এ বস্তুর আবিষ্কার, সেখানেই সর্বপ্রথম এর উৎপাদন। তার পরেই দুনিয়ার অন্যান্য দেশে এই বস্তুর রপ্তানি কার্য সম্পাদিত হয়েছে। আমাদের এ দেশে এ বস্তু রপ্তানি করা হয়েছিল ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের মোড়কে ভরে।

ইউরোপ তখন সামন্তবাদ থেকে রাজতন্ত্রে উত্তরণ লাভ করেছে, সে রাজতন্ত্রের উপর যদিও সামন্তবাদের ভূত পুরাপুরি চেপে বসেছিল। পরে এই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ-বিক্ষোভ এবং পরিণামে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তখন ইউরোপ রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরিত হয়, যদিও সে গণতন্ত্রের উপর প্রাচীন সামন্তবাদ ও পরবর্তী রাজতন্ত্রের ভূত পুরো মাত্রায়ই প্রভাবশালী হয়ে বসেছে। সে ভূত মানুষের উপর মানুষের নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতা, মানুষকে মানুষের দাসত্ব করতে বাধ্য করা- যেন তা সত্ত্বেও জনগণ মনে করতে থাকে যে, আমরা তো স্বাধীন!

বলা যেতে পারে, গণতন্ত্র তো স্বাধীনতার সনদ। এখানে দাসত্বের প্রশ্ন কী করে উঠতে পারে?

হ্যাঁ, কথাটি খুব সহজবোধ্য নয়, স্বীকার করছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলবো, গণতন্ত্র মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করার একটি বড় চাকচিক্যময় ফাঁদ- তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

গণতন্ত্রে সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্রের ভূত রয়েছে, আমি বলেছি। কেননা সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্রে ব্যক্তির নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রবলভাবে কার্যকর। গণতন্ত্রেও তাই। কেননা গণতন্ত্রে মৌলিকভাবে মানুষের নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। বাহ্যত তাতে বহু লোকের নিকট ক্ষমতা বিভক্ত দেখা গেলেও মৌলিকভাবে তাতে এক ব্যক্তিরই ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ–অপছন্দের প্রাধান্য বিরাজমান। তাই গণতন্ত্র মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে এক বিন্দু মুক্ত করে না; বরং নূতন করে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করে- এ কথা সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বে।

তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত রজানীতিতে গণতন্ত্র হচ্ছে একটি প্রচণ্ড ধোঁকা। এর ভিত্তিতে দেশে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। জনগণকে বোঝানো হয় যে, তারাই হচ্ছে দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা। তারা যা চাইবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা-ই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ সবই ধোঁকা, নিছক প্রতারণা মাত্র।

গণতন্ত্রে কার্যত তা কখনো হয় না। তাতে জনগণ বড়জোর একটা ভোট দেয়ারই অধিকার পায়; কিন্তু সেই ভোট লাভ করে যারা নির্বাচিত হয়, জনগণ আর তাদের নাগালের মধ্যে পায় না। তারা থাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত জনগণের আর কিছুই করার থাকে না। তারা ভোট দেয়ার পূর্বে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায় ভোট দেয়ার পরও। বস্তুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তনই সম্ভব হয় না।

আমাদের এ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে গণতন্ত্রের নির্বাচন তো বহুবার হলো; কিন্তু তার ফলে এখানকার জনজীবনে কোনো পরিবর্তন এসেছে বলে কি কেউ দেখাতে পারেন?"

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান রাজনীতিতে গণতন্ত্র জনগণের অধিকার হরণের একটা মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এক ব্যক্তি গণতন্ত্রের লড়াই করে করে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করেই সে গণতন্ত্রেরই দোহাই পেড়ে গণঅধিকার হরণ করে নেয়। প্রথমে সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে, তার পরে দ্বিতীয় বিপ্লবের' নামে জনগণের রাজনৈতিক ও মানবিক অধিকার হরণ করে এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একটি মাত্র দলে সকল মানুষের শামিল হওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে।

ফলে বহু কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র নিমিষে স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এটা কেমন করে হলো? হলো এজন্য যে, মৌলিক দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের মূলেই রয়েছে মানবীয় সার্বভৌমত্ব। আর মানবীয় সার্বভৌমত্ব কখনও ব্যক্তি ভিত্তিক চলে, কখনও চলে সমষ্টিভিত্তিক।

কেউ কেউ যুক্তি দেখাতে চায়, দেশে এখন (১৯৮৫) গণতন্ত্র নেই বলে আদর্শ প্রচারের কাজ করতে বড় অসুবিধা। তাই গণতন্ত্র হলে আদর্শ প্রচারের সুবিধা ও অবাধ অধিকার পাওয়া যাবে। কিন্তু এদেশের নিকট অতীতের ইতিহাস তাদের এ ধারণাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণ করে। গণতন্ত্রবাদীরা গণতন্ত্রের নিয়মে নির্বাচিত হয়ে প্রথমেই যে গণতন্ত্র তথা গণ-অধিকারকে রাজপথে জবাই করে, তা কি এদেশের লোকেরা নিজেদের চোখে দেখেনি? নিশ্চয়ই দেখেছে। কাজেই এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, গণতন্ত্র হলেও আদর্শ প্রচারে সুবিধা পাওয়ার কোনো আশা নেই।[১০] সুতরাং গণতন্ত্র ইসলামের পথ সুগম করে দেবে তা কেবল আহম্মক লোকেরাই মনে করতে পারে।

৪. গণতন্ত্রে নির্বাচন একটা বড় প্রতারণা মাত্র। ব্যাপারটা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। নির্বাচন দলভিত্তিক হোক বা নির্দলীয়, তাতে ব্যক্তিকেই প্রার্থী হতে হয় এবং ভোটদাতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভোট চাইতে অর্থাৎ ভোট ভিক্ষা করতে হয়।

কিন্তু ব্যক্তি কেন ভোট চাইবে? মানুষ যে জিনিসের মুখাপেক্ষী, যে দিক দিয়ে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, ব্যক্তি সাধারণত তা-ই পাওয়ার জন্য কষ্ট স্বীকার

করে। প্রয়োজন তীব্র হলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেও সে দ্বিধাবোধ করে না- যখন আর কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু ব্যক্তি- সে দলীয় বা নির্দলীয়- কেন লোকদের নিকট ভোট ভিক্ষা করবে? তার নির্বাচিত হওয়া কি তার নিজের জন্য প্রয়োজন, না জনগণের জন্য? জনগণের জন্য হলে তার তো বাড়ী বাড়ী ভোট ভিক্ষা করে বেড়ানোর প্রশ্ন উঠে না, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাকে ভোট দেবে। সে রাজী না হলেও জনগণ প্রয়োজন মনে করলে তাকে রাজী করাবে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য। তারাই তাকে বিজয়ী করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। অথচ এখানে হচ্ছে তার বিপরীত। শুধু তাই নয়, ভোট-প্রার্থীর ভোট ভিক্ষা এক মহাদুর্নীতি ও কঠিন স্বার্থপরতার ইঙ্গিত প্রদান করে। স্পষ্ট মনে হয়, তার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার মূলে নিহিত রয়েছে তার নিজের স্বার্থ- জনস্বার্থ নয়। তার মনে ক্ষমতা লাভ বা কোনো-না-কোনো ভাবে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লোভ উদগ্র হয়ে আছে এবং তার চরিতার্থতার জন্যই সে সদস্য নির্বাচিত হতে চাচ্ছে।

তাছাড়া ভোট পাওয়ার জন্য প্রচার-প্রোপাগান্ডা, ক্যানভ্যাসিং ইত্যাদির জন্য প্রার্থীকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়- সে টাকা তার নিজের হোক বা দলের পক্ষ থেকে দেয়া হোক; কিন্তু কেন এই টাকা ব্যয়?

এ টাকা তার নিজের হলে প্রশ্ন হচ্ছে, এই লক্ষ লক্ষ টাকা শুধু ভোট কেনার জন্য সে কোথায় পেল? কেমন করে এত টাকা সে যোগাড় করল? তার ও পরিবারবর্গের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের পরও সে এত টাকা এ কাজে কেমন করে ব্যয় করতে পারছে? বিরাট পুঁজিপতি নিশ্চয়ই। সেক্ষেত্রে তাঁর এ বিপুল পরিমাণ টাকা সংগ্রহের মূলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শোষিত-বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ নর-নারী, শিশু ও বৃদ্ধের হাহাকার। এহেন ব্যক্তির টাকা ব্যয়ের পরিণামে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণের সার্বিক কল্যাণ তো দূরের কথা, সাধারণ দু-একটি কল্যাণের কাজ করাও কি তার পক্ষে সম্ভব? আর সে তা করবেই বা কেন? সে তো নগদ মূল্যে সদস্যপদ ক্রয় করেছে। তা একান্তভাবে তার নিজের টাকা দিয়ে ক্রয় করা একটি সম্পদ। সুতরাং জনগণের কল্যাণের জন্য কিছু করতে কিংবা জনমতকে সমীহ করতে অথবা কোনো জনদাবি পূরণ করতে সে কোনোক্রমেই বাধ্য হতে পারে না।

পক্ষান্তরে, দল প্রার্থীর জন্য টাকা ব্যয় করলেও সে একই প্রশ্ন এবং একই পরিণতি। এ দুয়ের মাঝে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। তাছাড়া দলের কর্মীরা এক ব্যক্তির বিজয়ের জন্য শ্রম করবে কেন? সে যদি বিজয়ী হয়, তাতে কর্মীদের কী লাভ? হয়ত এটাই লাভ যে, তার কাছ থেকে পারমিট, লাইসেন্স ইত্যাদি পাওয়া যাবে। কিন্তু তা তো সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিরোধী দলের সদস্যের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। তা হলে কর্মীরা কেন এক ব্যক্তির জন্য শ্রম করবে? অতএব এরূপ নির্বাচনের ফলে জনগণের যে কোনো কল্যাণই সাধিত হয় না। হওয়া সম্ভব নয়, তাতে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ থাকে না।[১১]

৫. নির্বাচনের এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদী। এতে অংশগ্রহণ ও ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করে সদস্য নির্বাচিত হওয়া কেবল পুঁজিপতি ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। আর রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে অর্থনৈতিক পুঁজিবাদের যে ওতপ্রোত সম্পর্ক, তা তাত্ত্বিকভাবেও স্বীকৃত। আর এ কারণেই আজ পর্যন্তকার পুঁজিবাদী নির্বাচনসমূহের পরিণামে এদেশে বড় বড় পুঁজিপতিরই সৃষ্টি হয়েছে; তাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজিবাদী শোষণমূলক এক নিকৃষ্ট অর্থব্যবস্থা। পক্ষান্তরে, জনগণের দারিদ্র্য-দশা একবিন্দু হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে ক্রমাগতভাবে তা মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করছে।

এ পুঁজিপতি রাষ্ট্রকর্তারাই আমাদের দেশটিকে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশসমূহের নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছে। আমি বলবো, এই দেশটি মূলত কোনো দরিদ্র দেশ নয়। আমাদের এই দেশের পরতে পরতে, কন্দরে কন্দরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মহান আল্লাহর দেয়া অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। পুঁজিপতিরা নগদ টাকা ব্যয় করে প্রথমে সংসদ সদস্য ও পরে রাষ্ট্র পরিচালক হয়ে নিজেদের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির চিন্তায় দিন-রাত মশগুল ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে। দেশের এ সব সম্পদ কাজে লাগিয়ে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি এবং তার দ্বারা সাধারণ মানুষের অভাব মোচন ও জীবন-মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করার কোনো অবসর পায় না। সে চেষ্টাও তারা করে না, চেষ্টা করার প্রয়োজনও বোধ করে না। কেননা অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের জ্বালা যে কতখানি মর্মান্তিক, তা অনুধাবন করার সাধ্যও এদের নেই। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী রাজনীতি ও সমাজতন্ত্রবাদী

রাজনীতি সম্পূর্ণ একাকার- অভিন্ন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সাধারণ দরিদ্র জনতার কথা তাদের কারোরই মনে থাকে না; কেননা তারা তো সকলেই এ সদস্যপদ নগদ টাকায় ক্রয় করেছে। এখন ব্যয় করা সে টাকা যেমন তুলতে হবে, তেমনি পাঁচ বছর পর আবার যে নির্বাচন হবে তাতে ব্যয় করার জন্যও তাকে অনুরূপ আরও অধিক টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এ সব চিন্তায় প্রতিনিয়ত তাকে মশগুল ও ব্যস্ত থাকতে হয়। সরকার পক্ষের সদস্য হলে তো সুযোগের শেষ নেই; বিরোধী দলের হলেও তাকে নানান কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এ শুধু টাকার খেলা, দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত করার প্রতিযোগিতা মাত্র। এ কাজের প্রতি স্বভাবত আমাদের কোনো আকর্ষণ বা আগ্রহ নেই। অতএব এ কাজে আমরা নেই।

৬. বর্তমান গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ পুঁজিমালিকদের- সে ব্যক্তি হোক বা দল- এ যেন এক একটা লাভজনক ব্যবসা মাত্র। এ ব্যবসায়ে গরীব মানুষের পক্ষে অংশগ্রহণের কোনো প্রশ্ন উঠে না । প্রশ্ন উঠে না, সমাজের অপেক্ষাকৃত সৎ ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণকামী নিঃস্বার্থ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে। তাহলে একথা এক চিরন্তন সত্য হয়েই দাঁড়ায় যে, বর্তমান রাজনীতির পরিণামে কেবল পুঁজিপতিরাই সংসদ সদস্য ও রাষ্ট্র পরিচালনা বা রাষ্ট্রকর্তা নির্বাচিত হতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তিরা যতই সৎ ও জনকল্যাণকামী হোক, তাদের পক্ষে প্রচলিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ, নির্বাচনী অভিযান চালানো এবং সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া ও ক্ষমতাসীন হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই যে রাজনীতির আওতায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কেবল পুঁজিপতিরাই নির্বাচিত ও ক্ষমতার অংশীদার হতে পারে তা ইসলামের দৃষ্টিতেও অকল্যাণকর এবং অবৈধ। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আমরা বর্তমান রাজনীতি ও তার আওতায় অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনী কার্যক্রমে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

৭. বর্তমান অবস্থায় এক একটি সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় সরকারকেই বহু কোটি টাকা ব্যয় করতে হয় এবং তা সবই গরীব জনগণের অর্থে গঠিত জাতীয় ভাণ্ডার থেকেই ব্যয় হয়ে যায়। আর সেই সাথে প্রত্যেক প্রার্থীর ব্যয় করা বিপুল পরিমাণ অর্থ একত্র করা হলে

তার মোট পরিমাণ যে কত বিরাট হয়, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিরাট পরিমাণ জাতীয় সম্পদ ব্যয় করার পর জাতীয় জীবনের কী কল্যাণটি সাধিত হয়? আজ পর্যন্তকার নির্বাচনের ফলে জাতীয় সমস্যাবলির একটিরও কি সমাধান হয়েছে? নির্বাচনী অভিযানে ব্যয় করা এ টাকা কোনো-না-কোনোভাবে সমাজের টাউট-বাটপার ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল লোকদের হাতে এসে যায়। এই বিপুল পরিমাণের নগদ টাকা বাজারে এসে হঠাৎ করে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সহসাই বৃদ্ধি পেয়ে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার অনেক ঊর্ধ্বে চলে যায়। ফলে জনজীবনে নেমে আসে কঠিন দুর্ভোগ।

যে নির্বাচনের ফলাফল এতখানি মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী, সে নির্বাচনের সুযোগ পাওয়ার জন্য আজ যারা রাজনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে, দেশজুড়ে আন্দোলন করছে, তাদের মন-মানসিকতার অবস্থা পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ করলে চরম হতাশার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। স্পষ্ট মনে হয়, তারা জনগণকে শোষণ-লুণ্ঠন ও বঞ্চিত করে কিংবা বিদেশি পেট্রো-ডলারের মালিকদের নিকট হাত পেতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছে যা ব্যয় করার কোনো ক্ষেত্রই তারা পাচ্ছে না। দেশে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, সামান্য বস্ত্রের অভাবে আব্রু ঢাকতে পারছে না, মানুষের বাসোপযোগী ঘর-বাড়ী নেই বলে গাছতলায়, নর্দমার পার্শ্বে, ঝুপড়িতে পরিবার-পরিজন নিয়ে পড়ে থাকছে পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট অবস্থায়। তাদের জন্য এক পয়সা ব্যয় করতে এ টাকাওয়ালারা প্রস্তুত নয়। এই বঞ্চিতেরা যে মানুষ, তাদেরও যে জাতীয় অর্থ ও ধনীদের সম্পদে অংশ রয়েছে, সে কথা তারা বেমালুম ভুলে বসে আছে।

এ ধরনের লোকেরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে কিংবা মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হলে সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধিত হওয়ার কোনো আশা করা যেতে পারে কি? কোনো কল্যাণেরই আশা করা যায় না। তাই আমরা দেশের প্রচলিত রাজনীতিতেও নেই, নির্বাচনেও নেই। নেই এজন্য যে, এর ফলে জনগণের বিন্দুমাত্র কল্যাণ হয় না।

জাতীয় সমস্যাবলিরও এক বিন্দু সমাধান হয় না। দ্বীন ইসলাম কায়েম হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না।

৮. দেশের বর্তমান রাজনীতির ময়দানে যে সব দল বা জোট অত্যন্ত সক্রিয়, যাদের রাজনৈতিক তৎপরতাকেই রাজনীতি বলা হয়, তারা নির্বিশেষে সকলেই 'সেকিউলার'। তারা রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনে কোনোরূপ আদর্শিক পরিবর্তন আনার পক্ষপাতী নয়। তাদের রাজনীতির সারকথা হচ্ছে, 'হে এরশাদ! তুমি কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছ। তুমি সরে দাঁড়াও। এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমাদের। পৈতৃক কিংবা স্বামীর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জিনিস। তার ভোগদখল আমরাই করবো। অন্যকথায়, নিছক ক্ষমতা দখলই তাদের রাজনৈতিক তৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য। মূলত বর্তমান সরকার ও বিরোধী দল- জোটগুলোর মধ্যে আদৌ কোনো দ্বন্দ্ব থেকে থাকলে তা শুধু ক্ষমতার দ্বন্দ্ব- কোনো আদর্শিক মতপার্থক্যই এখানে নেই। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি যেমন সেকিউলার' বিরোধী দলজোটগুলোও তেমনি সেকিউলার।[১২]

এরশাদও বর্তমানে (১৯৮৫) রাজনৈতিকভাবে বিশেষ তৎপর। তার তৎপরতার সারকথা হচ্ছে, ক্ষমতা আমার হাতে। আমিই দেশের সর্বেসর্বা। (ফেরাউন যেভাবে দাবি করেছিল "আমিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।") তাই যে গণতন্ত্র আমার ক্ষমতাকে বিপন্ন করতে পারে বলে আশংকা হবে, তা আদৌ গণতন্ত্র নয়। যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন আমাকে দেশের 'নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট' হবার সুযোগ দেবে, তা-ই প্রকৃষ্ট নির্বাচন এবং তখনই দেশে গণতন্ত্র হলো বলতে হবে। তার নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ, জনদল গঠন, কয়েক দল নিয়ে ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা, শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টি গঠন ইত্যাদি একমাত্র সে উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। এ উদ্দেশ্য পূরণ হলে ক্ষমতা ছাড়ার কথা তো নয়ই বরং ক্ষমতায় অংশীদার বানাতে পারেন তাদেরকে যারা তাকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বানাবার লক্ষ্যে গঠিত দলে শামিল হবে।

এককথায়, বর্তমান রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি' তথা ক্ষমতা দখলের লড়াই। আমরা রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে এই কাড়াকাড়িকে অত্যন্ত জঘন্য দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে মারাত্মক এবং সম্পূর্ণ

নাজায়েয কাজ মনে করি। ক্ষমতা নিয়ে এ কাড়াকাড়ি জাতিকে চরম দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তাই প্রচলিত রাজনীতিতে আমাদের অনুপস্থিতি সর্বতোভাবে স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত।

৯. দেশের প্রচলিত রাজনীতিতে আমরা এ সব কারণেই অনুপস্থিত। তাছাড়া ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে যারা ক্ষমতায় বসে, তাদের ক্ষমতা থেকে ফেলে দিতে অস্ত্রধারী সামরিক বাহিনীর একটুও সময় লাগে না। কারণ যে ভোট পেয়ে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতায় এসেছে তা দেশের সমগ্র ভোটারের দশ ভাগের এক ভাগও নয়। তদুপরি এ ভোট জোর-জবরদস্তি করে অথবা লোভ-প্রলোভন দেখিয়ে অথবা জাল ভোটের মাধ্যমে আদায় করা হয়, যার সাথে ভোটারের হৃদয়ের কোনো সম্পর্ক থাকে না। থাকে না ঈমানের কোনো সম্পর্ক। তাই দেশে কোনো অভ্যুত্থান হলে জনগণ থাকে নির্লিপ্ত। বারবার এ অবস্থাই আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

১০. যে সব রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দল বর্তমান প্রচলিত রাজনীতিতে বিশেষভাবে তৎপর; তাদের মধ্যে দু'টি দল সম্পর্কে জনমনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। একটি দল দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে, অপরটি নাম ও মুখে 'ইসলামী' পরিচয় ব্যবহার করছে। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠাকামী ও ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী- এ দু'টি দলই কমিউনিজম ও ইসলামের মধ্যে রাতদিন ও আলো-আঁধারের চিরন্তন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্রকে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র পথ বলে প্রচার করছে; অথচ কমিউনিজম সম্পর্কে কার না জানা আছে যে, তাতে গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই, গণতান্ত্রিক উপায়ে তা প্রতিষ্ঠিত হয় বলেও তার চিন্তানায়করা কোনো দিন বলেনি, বরং তার নীতিতে সশস্ত্র বিপ্লবই হচ্ছে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। কিন্তু এরা সে পথে না গিয়ে পুঁজিবাদীদের সাথে মিলে রাজনৈতিক জোট বানিয়েছে। .... তা হলে বিপ্লবের কথা কি তারা ভুলে গেছে? ব্যাঘ্র কি ছাগল হয়ে ঘাস খেতে শুরু করল নাকি? ..... না, এটা তাদের একটা কৌশল- একটা ছদ্মবেশ?

'ইসলামী' বলে পরিচিত দলটি সম্পর্কেও এই প্রশ্ন। ১৯৪১ সনে আলীগড়ের স্ট্রেচী হলে প্রদত্ত 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' শিরোনামের ভাষণ যে দলটির সৃষ্টি করল, সে দলটি কীভাবে কারোর ভাষায় সমালোচিত ও

পরিত্যক্ত ধর্মহীন গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, তা জনগণের বোধগম্য নয়। পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতন্ত্রের সাথে দ্বীন ইসলামের কোনো সম্পর্ক আছে নাকি? না, এটাও তাদের সেকিউলার কৌশল?

এসব কারণে গণতন্ত্র উদ্ধারের প্রচলিত রাজনীতিটি ইসলামের পক্ষের লোকদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের মতে, ইসলামের দৃষ্টিতে এ 'গণতন্ত্র' একটি কুফরী আদর্শ। এতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নয়, মানুষের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। আর আমরা যেহেতু আল্লাহর অবিভাজ্য, শাশ্বত সার্বভৌমত্বের প্রতি ঈমানদার, তাই তথাকথিত মানবীয় সার্বভৌমত্বভিত্তিক গণতন্ত্র উদ্ধারের প্রচলিত রাজনীতিতে আমরা নেই। আমাদের এখানে না থাকাটা খুব স্পষ্টরূপে ঈমানের ব্যাপার। আর মনে রাখতে হবে, সেকিউলার কৌশলের সাহায্যে অন্য কোনো তন্ত্র-মন্ত্র কায়েম হলেও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয় না। হলে আল্লাহর রাসূল প্রাণান্তকর কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতেন না।

১১. বর্তমানে (১৯৮৫) যে সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে শরীক হওয়ার জন্য অস্থির ও উদগ্রীব, তারা যেমন বর্তমান সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী-পদে আসীন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিরোধী শিবিরেও। সরকার পক্ষের লোকদের, বিশেষ করে মন্ত্রীদের একটা লজ্জা ও সংকোচের ব্যাপার হচ্ছে, তারা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত নন, অথচ মন্ত্রী হতে হলে আগে জনগণের সমর্থন ও বিজয়সূচক ভোটপ্রাপ্তি জরুরি। কিন্তু বর্তমানে তারা কেবল এক ব্যক্তির অনুকম্পার পাত্র হিসাবে মন্ত্রী পদে অভিষিক্ত। অনুকম্পাকারী ইচ্ছা হলে যে কোনো মুহূর্তে তাদের তাড়িয়ে দিতে পারে। (সামরিক সরকারের বানানো প্রধানমন্ত্রী সাহেবের পদচ্যুতিতেও কি তাদের আক্কেল হয়নি?) তাই তাদের জন্য গণতন্ত্র' অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচন একান্ত দরকার। তাহলে তারা সহজেই নির্বাচিত হতে পারবে; কেননা তারা ক্ষমতাসীনের অত্যন্ত বশংবদ। ভোটারবৃন্দ ভোট না দিলেও তাদের বাক্স ব্যালট' ভর্তি হতে ও শেষে বিজয়ী বলে ঘোষিত হতে কোনো অসুবিধা হবে না। অতএব গণতন্ত্র, অর্থাৎ নির্বাচন যত তাড়াতাড়ি হয়, তাদের মান রক্ষার জন্য ততই মঙ্গল।

এ কারণে তাদের গণতন্ত্র চাওয়ার ব্যাপারটি জলবৎ তরলং। কিন্তু বিরোধী দল ও জোটসমূহ কি কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানাচ্ছে, তা বোঝা গেল না। তারা কি জানে না যে, তাদের কেবল সেই প্রার্থীই নির্বাচিত হবে যার প্রতি ক্ষমতাসীনের অনুকম্পা হবে; এ জন্য যে, ভবিষ্যত সংসদের বিরোধী বেঞ্চে তার মতো একজন লোকের উপস্থিত থাকা দরকার। অবশ্য তার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাসীনের জন্য অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব হলে সেও (অর্থাৎ বিরোধী প্রার্থী) নির্বাচিত হতে পারবে না; তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভোট না পেলেও সে নির্বাচিত হবে। বিরোধী দলীয় প্রার্থী বাক্স ভর্তি ভোট পেয়ে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হলেও পরে বলা হবে, গুনতিতে ভুল হয়েছে। এই কথাকে অসত্য বলার মতো বুকের পাটা কারো আছে কি? '৭৩ সনে, '৭৯ সনে এবং '৮১ সনে কি তা-ই হয়নি? গণভোট নামের প্রহসনে এবং উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনেও কি তা-ই ঘটেনি? আগামী প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনেও যদি আদৌ তা হয়- ঠিক তা বা ভয়াবহ ধরনের চাইতেও কারচুপি হবে না, তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেন কি?[১৩]

দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজন

না, সে নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। পারে না যে, তা' '৮৬ সনের ৭ই মে অনুষ্ঠিত তথাকথিত সংসদ নির্বাচন বাস্তবভাবেই প্রমাণ করেছে। ('৮৫ সনের ২৬শে অক্টোবরের নির্বাচন সম্পর্কে যা যা বলেছিলাম '৮৬ সনের ৭ই মে'র নির্বাচনে সে সব কথাকে পরম সত্যরূপে প্রমাণ করে দিয়েছে।)[১৪] এ নির্বাচন ছিল নীলনকশার নির্বাচন। এ নির্বাচন হয়েছে বিদেশী শক্তির প্ল্যান-প্রোগ্রাম অনুযায়ী এবং সে প্ল্যান-প্রোগ্রাম হচ্ছে বাংলাদেশে রুশ-ভারত অক্ষশক্তির অধীন। একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করা। এ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ভোটদাতাদের ভোটের মাধ্যমে হয় নি, হয়েছে প্রার্থীপক্ষের কর্তৃপক্ষীয় বিভিন্ন বাহিনীর উপস্থিতির জোরে, তাদের সাহস ও সমর্থন পেয়ে কর্মীদের মাধ্যমে ভোট বাক্সে ইচ্ছামত সীল দিয়ে ব্যালটপত্র ঢুকিয়ে। এটা ভোট যুদ্ধ ছিল না, ছিল ব্যালট যুদ্ধ। যা গণনা করা হয়েছে, তার শতকরা দশটাও ভোট ছিল না, ছিল ঢোকানো ব্যালটপত্র। তা শত শত নয়, হাজার হাজার।

একেকজন প্রার্থী লক্ষাধিক (ভোটে নয়) ব্যালটপত্রে জয়ী হয়েছেন এবং তাদের নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যালটপত্র ছিল লক্ষাধিকের মুকাবিলায় ৫০-৬০ হাজার। অথচ এলাকার মোট ভোটের সংখ্যা (মুদ্রিত তালিকা অনুযায়ী) লাখ-সোয়া লাখের বেশি হবে না। তাহলে কি ধরে নিতে হবে, তালিকা অনুযায়ী সমস্ত ভোটার পুলিং বুথে এসে ভোট দিয়ে গেছেন? না, যে কোনো এলাকার যেকোনো নাগরিক ভোটারকে জিজ্ঞেস করুন, কত পার্সেন্ট ভোটার ভোট দিতে গেছেন? জবাব শুনবেন, শতকরা ৭-৮ জনের বেশি নয়। তাহলে এই ব্যালটপত্রগুলো এল কোত্থেকে? নিশ্চয়ই প্রার্থী পক্ষের লোকেরা তা ঢুকিয়েছে। অনেক ভোটকেন্দ্রেই এমন হয়েছে যে, প্রকৃত ভোটার ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হলে তাদেরকে বলা হয়েছে, বাড়ি যান, আপনার ভোট দেয়া লাগবে না, আগে দেয়া হয়ে গেছে।' এই ব্যালট যুদ্ধে শরীক প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বলেছে, জাতীয় পার্টি কারচুপি করেছে। জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কারচুপিতে আওয়ামী লীগ সিদ্ধহস্ত, ওরাই বেশি কারচুপি করেছে। জামায়াত বলেছে, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি উভয়ই ব্যাপক কারচুপি করেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, জামায়াতও যে ভোট কারচুপি করতে পারে, তা এই প্রথম দেখলাম।

এর অর্থ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে এবং তাতে কম-বেশি সবাই চরম প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। তাছাড়া অস্ত্রের ঝনঝনানি, বড় বড় রামদাও, বল্লম, ছোরা, পিস্তলে ব্যাপক প্রদর্শনী এবং কোথাও কোথাও তার ব্যাপক ব্যবহারও হয়েছে।

এই যা কিছু হয়েছে, তা সবই ছিল অবধারিত। বৃটিশ প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এ না হয়ে পারে না। এ জন্য কাউকে বিশেষভাবে দোষী করে লাভ নেই। গণতন্ত্রের এই নিয়মে যতবারই নির্বাচন হবে, তাতে এটা ঘটবেই; এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। আর তা ঘটবে সরকারের ইচ্ছানুযায়ী, তা যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন।[১৫]

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, নির্বাচনে শরীক যে দল যতটা আসনই পেয়েছে, তা পেয়েছে এ জন্য যে, কর্তৃপক্ষ তাকে সেই ক'টি আসনই দিতে চেয়েছে। তার অধিক আসন দেয়ার সিদ্ধান্ত ছিল না বলেই তা দেয়া হয়নি।

কাজেই বৃটিশ প্রবর্তিত তথাকথিত গণতন্ত্র এবং সেই গণতন্ত্রের নির্বাচন দ্বারা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচন কখনই সম্ভব হবে না। একথা আজ নিঃসন্দেহ বাস্তব ঘটনাবলির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়ে গেল। আমাদের মতে তাই এ গণতন্ত্রকে উৎখাত করতে হবে। এ গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ পরিহার করে গণচেতনা ও গণঐক্যের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। ঘটাতে হবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিপ্লব।

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে যে, এর সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কেননা গণতন্ত্রের পথে কেউ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও তার পক্ষে কোনো কিছু করা আদপেই সম্ভব হবে না- না আদর্শিক দিকে কিছু, না জনকল্যাণমূলক কিছু; বরং সত্যি কথা হচ্ছে বর্তমান প্রশাসনিক অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেশের অবস্থায় কার্যত কোনো পরিবর্তনই আসবে না। যার হাতে ক্ষমতা রয়েছে, তার হাতেই তা থেকে যাবে। অবশ্য তাতে তার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট (?) হওয়ার খাহেশটা পূরণ হবে। বেআইনী, অবৈধ শাসনকে জনসমর্থনের দোহাই দিয়ে বৈধ ও আইনসম্মত সরকার বলে দুনিয়ায় প্রচার চালানো যাবে। তা-ই হয়েছে। বলা হবে, দেশবাসী তাকেই সমর্থন করে, তার বিরোধীদের কোনো জনসমর্থন নেই। অথচ এর মতো ধাপ্পাবাজি আর কিছু হতে পারে না। আমরা মিথ্যাকে সত্য করা, অবৈধকে অন্যায়ভাবে বৈধ করার, সর্বোপরি এই ধাপ্পাবাজির ইন্ধন যোগানোর কাজে কোনো সহায়তাই করতে প্রস্তুত নই। তাই নিরপেক্ষ বা 'কেয়ারটেকার সরকারের অধীন নির্বাচন চাই' বলে চিৎকার করতেও আমরা রাজী নই। কেউ কেউ হয়ত মনে করেন যে, ইসলামী আন্দোলনের অংশ হিসাবে নির্বাচনে অংশ নিলে জনগণের নিকট কথা পৌঁছাবার একটা বড় সুযোগ পাওয়া যায়।

আমি বলবো, প্রচলিত নির্বাচন কেবল গণতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হতে পারে, ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের নয়। কেননা নির্বাচনকালে যে সব কথা বলতে হবে, তার সাথে ইসলামী বিপ্লববাদীর কথার এক বিন্দু মিলই হতে পারে না। নির্বাচনে ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে বলা কথা বিপ্লবী কথা নয়, গণতান্ত্রিক কথা। আর নির্বাচনের ফলে অনিবার্যভাবে যখন পরাজয় বরণ করা হবে, তখন দেশবাসী ও বিজয়ীরা বলবে এদেশের লোকেরা ইসলাম চায় না। চাইলে ইসলামের পক্ষেই তারা

ভোট দিত। (হাফেজ্জী হুজুরের নির্বাচনে লজ্জাকর ব্যর্থতা বাস্তবে তা-ই প্রমাণ করেছে)।[১৬]

১২. সর্বোপরি এ পথে আর যা-ই হোক, দ্বীন-ইসলাম কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। দ্বীন-ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ, তা কায়েম করার পন্থা ও পদ্ধতিও তার ইসলামের) নিজস্ব। ধার করা কোনো পন্থায় বিশেষ করে কুফরী নীতি ও অনৈতিক পন্থায় ইসলাম কায়েম হতে পারে না। বর্তমানে প্রচলিত নির্বাচন ক্ষতি যে ধর্মনিরপেক্ষ, অর্থাৎ ধর্মহীন ইউরোপ থেকে গৃহীত পন্থা, তা আগেই বলেছি। তাই যে পথে ইসলাম কায়েম হবে না সে পথে একটি মুহূর্ত, একটি পয়সা এবং একবিন্দু শক্তি-ক্ষমতা ব্যয় করা আমাদের ঈমানের পরিপন্থী।

জিহাদই কাম্য

তাই আমরা প্রচলিত রাজনীতিতে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। আগেই বলেছি, আমাদের এ অনুপস্থিতি আমাদের দ্বীন ও ঈমানের সাথে পুরাপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। তাতে উপস্থিত থাকাই বরং ঈমানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ।

আমরা প্রচলিত রাজনীতির ময়দানে অনুপস্থিত। তাহলে আমরা কোথায়, কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত? আমরা কি দ্বীনের ও দেশের বিষয় চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করে ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি?

না, আমরা নিষ্ক্রিয় নই। আমরা ঘরের কোণায়ও আশ্রয় নিইনি। আমরা যা করছি তা প্রচলিত রাজনীতি নয়, এক কথায় তা হচ্ছে জিহাদ-আল্লাহর পথে।

"জিহাদ" শব্দের শাব্দিক অর্থ : নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। আর কুরআনী পরিভাষায় তার অর্থ : আল্লাহর আনুগত্য ও তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চালানো। এখানে কেবল জিহাদই নয়, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ– আল্লাহর পথে জিহাদ। অর্থাৎ এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের

উদ্দেশ্যে। ইহকাল ও পরকালে এবং তা চলতে হবে আল্লাহ নির্দেশিত পথে, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম-বিধান অনুযায়ী।

প্রচলিত রাজনীতি আমরা করছি না। কেননা তা করার জন্য আল্লাহ আমাদের আদেশ করেন নি। পক্ষান্তরে, আমরা 'জিহাদ' করছি এ জন্য যে, মহান আল্লাহ তা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন। বলেছেন :

وَجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

> তোমরা জিহাদ করো তোমাদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ বিনিয়োগ করে, আল্লাহর পথে। তোমরা যদি জানো-বুঝ, তাহলে এই কাজই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, সর্বাধিক কল্যাণময়। (সূরা আত তাওবা : ৯১)

বস্তুত জিহাদ অর্থ মারামারি, কাটাকাটি নয়। জিহাদ অর্থ সর্বাত্মক চেষ্টা, কষ্ট স্বীকার, লক্ষ্য অর্জনের সাধনা-সংগ্রামে সকল শক্তি নিয়োগ করা। জিহাদের লক্ষ্য আল্লাহ-বিরোধী সকল শক্তি দমন করা, পরাভূত করা এবং সকল প্রকার খোদাদ্রোহী প্রতিষ্ঠানকে উৎখাত করে সর্বক্ষেত্রে এক মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আইন-বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত করা; আল্লাহর দ্বীন কার্যত প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করা।

এজন্য ব্যক্তিগণের প্রথম কাজ হচ্ছে নিজেদের নফস তথা মন-মানসিকতাকে আল্লাহর অধীন ও অনুগত বানানো। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, স্বীয় পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর অনুগত বানানো এবং শেষ পর্যায়ের কাজ হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আল্লাহর অধীন ও অনুগত বানানো।

এ কাজে প্রথম বাধা আসে নিজের নফসের দিক থেকে। কেননা নফস মানুষকে খোদাদ্রোহিতায় উদ্বুদ্ধ করে এবং নাফরমানির কাজ করতে প্ররোচিত করে। তাই প্রথমে নফসই যদি আল্লাহর অধীন ও অনুগত হয়, তাহলে সেই নফসই মানুষকে পরবর্তী ক্ষেত্রসমূহে আল্লাহ বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি যোগাবে।

জিহাদের এই মৌল দর্শন আমরা রাসূলে করীম (সা.)-এর কর্মনীতিতে পুরোপুরি প্রতিফলিত দেখতে পাই। তিনি মক্কী জীবনের তেরটি বছর নিজে ও ইসলাম গ্রহণকারীদের নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করে সকলকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন এবং এখানে তিনি এক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন।

বস্তুত রাসূলে করীম (স) প্রতিষ্ঠিত এ সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল আল্লাহর সার্বভৌমত্বভিত্তিক এবং তার বিধান কুরআন মজীদের পুরাপুরি অনুসারী। এই সমাজের নাগরিকগণ ছিলেন কুরআনের মানদণ্ডে তৈরি প্রকৃত মুজাহিদ। তাদের পরিচিতি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়েছেন এই ভাষায় :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَه أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا
سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَه
فَاٰزَرَه فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ
بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ـ

> মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সঙ্গী-সাথী, তারা কাফির ও কুফরীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত অনমনীয়, কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি অতিশয় দয়াবান। তুমি (যখনই) তাদের প্রতি তাকাবে, দেখবে তারা অবনত, আত্মসমর্পিত। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রত আর আত্মসমর্পণের চিহ্নই তাদের মুখমণ্ডলে দীপ্ত প্রতীক। (সূরা আল-ফাতহ : ২৯)

তাঁরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগত বানিয়ে নিয়েছিলেন নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। ফলে তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল বাইরের

আল্লাহদ্রোহী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করা এবং সকল প্রকার মানবীয় সার্বভৌমত্বভিত্তিক রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানাদির মূলোৎপাটন করা। তারাই পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত করেছিলেন আল্লাহর এই নির্দেশ :

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ-

> তোমরা (সশস্ত্র) যুদ্ধ করো ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে, যেন অনৈসলামী অবস্থা ও বিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সার্বভৌমত্ব (ও তার মুকাবিলায় আনুগত্য) সম্পূর্ণরূপে ও একান্তভাবে আল্লাহরই প্রতিষ্ঠিত হয়। (সূরা আনফাল : ৩৯)

রাসূলে করীম (স)-এর জীবনে আমরা দেখতে পাই, তিনি মক্কা থেকে মুসলমানদের নিয়ে মদীনায় একত্রিত হলেন। মদীনায় প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যেও ইসলাম গ্রহণকারী লোক ছিলেন। উভয় শ্রেণীর লোকদের সমন্বয়ে এক ঐক্যবদ্ধ আদর্শপরায়ণ লোকসমষ্টির সমাবেশ ঘটলো। ফলে মদীনা জনপদের প্রাচীন অধিবাসীরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে নেতা ও বাদশাহ বানানোর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে বানচাল হয়ে গেল এবং সেখানে নবী করীম (সা.)-এর নেতৃত্ব এমনভাবে কায়েম হলো যে, মদীনা সনদের ভিত্তিতে ইয়াহুদী সমাজও তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে আমি বলতে চাই, একটি আদর্শবাদী ঐক্যবদ্ধ সমাজ-সমষ্টি তার ব্যক্তিদের সংখ্যা যাই হোক সাধারণ গণমানুষকে আদর্শ সচেতন বানিয়ে আদর্শের ভিত্তিতেই ঐক্যবদ্ধ করতে পারে– পারে এই আদর্শ-সচেতক ব্যক্তি-সমষ্টি একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়ে গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করতে– পারে বাতিল, গায়ের ইসলামকে খতম করে ইসলামী আদর্শকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে। আমরা আধুনিক ভাষায় একেই বলি ইসলামী বিপ্লব।

এ পথ যে কিছুমাত্র কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এ পথে যে কঠিন দুরতিক্রম্য ঘাঁটি ও বাঁকসমূহ রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রতিষ্ঠিত শক্তি যে এ কাজে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়াবে, এ প্রচেষ্টাকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দেবে–

দিতে চাইবে, তাও অকল্পনীয় নয়। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে মহান আল্লাহর বাণী:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

আর যারাই আমার দিকে, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জিহাদ করবে আমরা তাদেরকে আমাদের পথসমূহ অবশ্যই দেখাব- পরিচালিত করব। আর আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই রয়েছেন মুহসিন– ঐকান্তিক অনুগত ও নিষ্ঠাবান লোকদের সঙ্গে। (সূরা আনকাবুত : ৬৯)

বস্তুত এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার ঘোষণা এবং এ ঘোষণা কেবল আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জিহাদে অবতীর্ণ হলেই তা পাওয়ার প্রশ্ন; গণতন্ত্র উদ্ধারের প্রচলিত রাজনীতি করলে সেক্ষেত্রে এর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আর এ জিহাদে অবতীর্ণ হলেই শহীদ হওয়া কিংবা গাজী হওয়া সম্ভব। 'শাহাদাত' কেবল আল্লাহর পথে জিহাদেই লাভ করা সম্ভব। আমরা গাজী হতে না পারি, নিয়ত খালেস হলে শাহাদাত তো পেতে পারি। সে পাওয়া এ দুনিয়ার রাজত্ব পাওয়ার তুলনায় অনেক বড় পাওয়া। দুনিয়ার রাজত্ব পাওয়ার সাথে তার কোনো তুলনাই হতে পারে না। এক্ষেত্রে কারোর প্রার্থী হওয়ার, ভোট ভিক্ষা করার, ক্যানভাস করার বা টাকা দিয়ে ভোট কেনার কোনো প্রশ্ন নেই, অবকাশও নেই। জনগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে বাছাই করে নেবে তাদের নেতা। ইসলামী জিহাদের ফলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব হবে।

তাই আমাদের নিকট প্রচলিত রাজনীতি নয়– জিহাদই কাম্য। এই জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য আমরা আকুল আহ্বান জানাচ্ছি এ দেশের কোটি কোটি মানুষকে।

এ লক্ষ্যে আমরা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করছি। ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত তাদের সামনে পেশ করছি। যে কালেমা পড়ে আমরা মুসলমান হই, ইসলামের সেই মূলমন্ত্র কালেমা তাইয়্যেবার বিপ্লবী অর্থ জনগণকে জানাতে চেষ্টা করছি; তা আয়ত্ত করতে মনমগজে দৃঢ়ভাবে বসাতে ও সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলছি। কুরআনের দারস পেশ করে ইসলামের মূল আদর্শ ও শিক্ষাকে সাধারণ্যে ব্যাপক প্রচার করতে চেষ্টা করছি এবং এ লক্ষ্যে কাজ করতে প্রস্তুত লোকদেরকে স্থানীয়ভাবে সদস্য হিসাবে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে বলছি। এভাবে সারা দেশের সংঘবদ্ধ জনতাই পরিশেষে একটি শক্তিতে পরিণত হবে এবং এ শক্তিই ইসলামী বিপ্লবের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

[১৯৮৫ সনের ২৬ শে অক্টোবর ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে প্রদত্ত ভাষণের লিখিত রূপ]

টীকা

১. স্মর্তব্য, একথা বলা হয়েছিল ১৯৮৫ সনের শেষ দিকে। এর পরবর্তী পাঁচ বছরে দেশের বেসামরিক শাসন চালু থাকলেও চরিত্রের দিক দিয়ে তা সামরিক শাসন থেকে ভিন্নতর কিছু ছিল না।

২. ১৯৯১ সালে সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় পদ্ধতি চালু করার পর থেকে এই ক্ষমতা ভোগ করছেন সরকার প্রধান।

৩. ১৯৯১ সালের পর অবশ্য বিচার ব্যবস্থাকে আবার কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।

৪. এ কথার সময়-কাল ১৯৮৫।

৫. ১৯৮৬ ও '৮৭-এর সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও একই রূপ প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে ভোটারবিহীন ভোট গণনার দরুন।

৬. ১৯৮৫ সালে একথা বলা হয়েছে।

৭. শব্দটির অভিধানিক অর্থ হলো- রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার মতবাদ।

৮. উল্লেখ্য যে, কথাটি বলা হয়েছে ১৯৮৫-এর বিরাজমান পরিস্থিতিতে, যার সাথে বর্তমান অবস্থার বাহ্যিক মিল না থাকলেও চরিত্রগত মিল রয়েছে।

৯. এ প্রসঙ্গে ১৯৫৪, ১৯৭০, ১৯৭৩, ১৯৯১ এবং ১৯৯৬-এর গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অভিজ্ঞতা এখানে স্মর্তব্য। পরবর্তীকালে ২০14 এবং ২০1৮ সালের নির্বাচনে একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

১০ ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর থেকে ঐ যুক্তি প্রদর্শনকারীরাই একথার যথার্থতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, যদিও এখন পর্যন্ত তাদের মোহমুক্তি ঘটেনি।

১১ দেশে বর্তমান গণতন্ত্র সংসদের সদস্যবর্গের কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করলেই একথার সত্যতা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হবে।

১২ কথাটি ১৯৮৫ সালের প্রেক্ষাপটে বলা হলেও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও এটি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

১৩ এমনকি ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০৮ সালে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের ব্যবস্থাধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে বলে বিরোধী দল অভিযোগ করেছে।

১৪ ১৯৮৬ সনের ১৫ই অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ১৯৮৭ সনের ৩রা মার্চের নির্বাচন সত্যকে প্রমাণ করেছে আরো নগ্নভাবে।

১৫ ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

১৬ আর ১৯৯১ ও ১৯৯৬-এর নির্বাচনে ইসলামী দল ও জোটসমূহ এবং পীর-মাশায়েখরা চরমভাবে পরাজিত হওয়ায় এ সত্য তো আরো নগ্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম [রহ.]

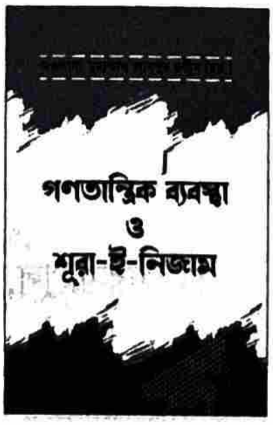
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শূরা-ই-নিজাম

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

ও

শূরা-ই-নিজাম

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম [রহ.]



প্রকাশনায়

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) রিসার্চ ফাউন্ডেশন

৮৫/১-এ (৪র্থ তলা), পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৭১৩৩৭৩৩৩, ০১৭১৮৩৭৮৯৯৬

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শূরা-ই-নিজাম

গণতন্ত্র বর্তমান দুনিয়ার একটি বহুল আলোচিত মতবাদ। মানুষ এ দুনিয়ায় বসবাসের জন্য নিজের আইন নিজেই তৈরি করবে। দুনিয়ার এক বিপুল সংখ্যক মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি প্রচণ্ডভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাদের কাছে গণতন্ত্র হচ্ছে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা; এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষ অর্জন করতে পারে তার কাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি তাই? পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মানুষ কি সুখ ও শান্তির দরিয়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ? এ প্রশ্নটি সম্ভবত গণতন্ত্রপ্রেমীরা আদৌ খতিয়ে দেখেন না। তাই গণতন্ত্রের নামে দুনিয়ায় যত শোরগোল উঠছে, মানুষের জীবনে দুঃখ-দৈন্য ততই বাড়ছে। এমনকি সত্য কথা এই যে, গণতন্ত্রের হোতারাই মানুষকে দুঃখ ও দৈন্যের মুখে ঠেলে দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

এটাই স্বাভাবিক। কারণ, গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব বিস্তারের এক সর্বনাশা প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় মুষ্টিমের ধূর্ত ও শঠ প্রকৃতির মানুষ খুব সুকৌশলে বৃহত্তর জনসমাজের ওপর প্রভু হয়ে বসে। তারা নানা মুখরোচক বুলির আড়ালে সাধারণ মানুষকে দাসানুদাসে পরিণত করে এবং তাদের ভাগ্য নিয়ে ইচ্ছামতো ছিনিমিনি খেলে। আর হতভাগা মানুষ একেই স্বাধীনতা ও স্বাধিকার ভেবে গণতন্ত্রের জন্যে প্রাণপাত করে। সুখের মুখ তারা কোনোদিনই দেখে না; তা চিরকাল শুধু সোনার হরিণরূপে ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

অথচ মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদ্ধতি। মানুষ নিজের আইন নিজেই তৈরি করবে না। কারণ এই মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই দিয়ে দিয়েছেন মানুষের জন্য আইন বিধান, তাঁর হুকুমেই চলবে সব কিছু। এসব বিষয় নিয়েই ১৮৮২ সালে তাঁর অনুগত ছাত্রদের এক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে মওলানা বলেন ঃ

আজকে আমি এখানে যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাই তা হলো ইসলামে শূরা-ই-নিজাম বলতে কী বুঝায় এবং বর্তমানে আমাদের দেশে যে গণতন্ত্রের কথা বলা হয় সেটাই-বা কী জিনিস, কোথা থেকে এর উৎপত্তি এবং মূলত এর উদ্দেশ্যই বা কী?

মওলানা বলেন : 'শূরা' শব্দটি কুরআন মজীদের একটি সূরার নাম । এর শাব্দিক অর্থ হলো পরামর্শ করা অথবা পরামর্শভিত্তিক একটি ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে, বর্তমান দুনিয়ায় যে গণতন্ত্র প্রচলিত তাকে বলা হয় Democracy। এটি আসলে একটি 'ল্যাটিন শব্দ'। এর প্রথমাংশ Demo মানে 'গণ' এবং cracy অর্থ তন্ত্র বা 'আইন'। এই মিলিয়ে বানানো হয়েছে গণতন্ত্র; অর্থাৎ এ এমন একটি ব্যবস্থা যা জনগণের মর্জি অনুযায়ী চলে। এবার এ দু'টির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যাক। তবে এ তুলনামূলক আলোচনারও একটি পদ্ধতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে— যেটাকে 'লজিক' বা মানতেক (যুক্তিবিদ্যা) যুক্তিধারা বলা হয়।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, এই দু'টি ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী ? এ পর্যায়ে বলতে গেলে অন্তত দুই রকমের সম্পর্ক দেখানো যেতে পারে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে تَوَافُقْ (তাওয়াফুক) পারস্পরিক সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য। আর একটি হচ্ছে ইন্দাজ কণ্ঠতম تَبَايُنْ (তাবায়ান) পারস্পরিক বিরুদ্ধতা বা বৈসাদৃশ্য অর্থাৎ দু'টির মধ্যে কোনো মিল নেই। এছাড়া আর একটি হচ্ছে عَمَا خَاصْ مَطْلَقْ (আম খাস-মাতলক)- এ এমন একটি পরিভাষা যে, দু'টি জিনিসের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু মিল পাওয়া যায় আবার অনেক জায়গায় মিল পাওয়া যায় না। যাই হোক এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, প্রচলিত গণতন্ত্র ও ইসলামের শূরা-ই-নিজাম এ-দু'টির মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে تَبَايُنْ (তাবায়ুন) অর্থাৎ পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একটি অপরটির সঙ্গে কোনো দিক দিয়েও একবিন্দু মিল, সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য রাখে না।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে গণতন্ত্র প্রচলিত, তা দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও চালু আছে। আসলে এটি একটি মতবাদ- একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন। যার দু'টি দিক আছে— একটি হচ্ছে তাত্ত্বিক অন্যটি বাস্তব।

মাওলানা বলেন ঃ 'তাত্ত্বিক দিক দিয়ে গণতন্ত্র বলতে যে জিনিসটিকে বোঝায় সেটাকে কুফর ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এটি একটি জীবন দর্শন— তা ইসলামের ঠিক বিপরীত জিনিস। প্রথম কথা হলো ইসলাম ও গণতন্ত্র এ দু'টিই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিষয়। রাষ্ট্রের অধীন সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে এক একটা ব্যবস্থার নাম দেয়া হয়েছে। সে হিসেবে এক বিশেষ ধরনের সমাজ ব্যবস্থার নাম দেয়া হয়েছে গণতন্ত্র। অপর এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থার নাম হচ্ছে 'ইসলাম'।

সমাজ ব্যবস্থা বলতে আমি বুঝাতে চাইছি সমাজের মূল দার্শনিক ভিত্তি। সে হিসেবে সমাজের কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, রীতি-নীতি, তার আইন-বিধান, রাষ্ট্র-পদ্ধতি, রাষ্ট্র পরিচালন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, শাসক নিয়োগ পদ্ধতি এ সব কিছুই এর আলোচনার বিষয়ে আসে। ইসলামের অবলম্বিত সামাজিক ব্যবস্থা কীরূপ ? সেখানে অনুসৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বা কী— সব কিছুই এই আলোচনার বিষয় হিসেবে আসে।

এদিক দিয়ে বলা যায় যে, গণতন্ত্র আর ইসলাম দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতাদর্শ। বিপরীত দর্শন, বিপরীত ভাবধারা ও বিপরীত ব্যবস্থাসম্পন্ন জীবন দর্শন। কোথাও এ দুয়ের মাঝে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেকোনো সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় এবং যার জবাব দিতেও তারা বাধ্য, তা হলো সার্বভৌমত্ব কার ? Sovereignty belongs to whom—কে সার্বভৌমত্বের মালিক ? মূলত সার্বভৌমত্ব এমন একটি জিনিস যা ছাড়া কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে না। মানুষের কোনো সামষ্টিক সংস্থা গড়ে উঠতে পারে না সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া। সুতরাং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে একটি ধারণা গ্রহণ করতেই হবে। তারপর তারই ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এছাড়া কোনো সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি যে কোনো দৃষ্টিতেই বিবেচনা করলে প্রশ্নটি সর্বাগ্রে চিন্তাবিদদের মনে জাগবে এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সামনে এক বিন্দুও অগ্রসর হওয়া যাবে না। কাজেই দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যত আলোচনার বিষয় এসেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সর্বপ্রথম প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন।

প্রচলিত গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্যে নয়। তাতে বরং আল্লাহকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর এই অস্বীকার করা হয়েছে দু'টি রূপে। একটি রূপ হলো— আল্লাহ আছেন বটে, কিন্তু তিনি আসমানে থাকেন। এই জমিনের মানুষের ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব চলে না। আল্লাহর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার না করেও বাস্তবভাবে মানুষের সমাজ জীবন, বৈষয়িক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে আল্লাহকে সম্পূর্ণ বেদখল করে দেয়া এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য। অন্য রূপটি হলো— না, আল্লাহ বলতে কেউ নেই। সব কিছু আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটা হলো ডারউইনী বিবর্তনবাদের মূলকথা। পাশ্চাত্যে এই মতাদর্শনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।

গণতন্ত্রের উৎপত্তি

গণতন্ত্রের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে, এর উৎপত্তি হয়েছে ইউরোপে এবং সূচনা হয়েছে ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে কিংবা চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে। তখন গোটা ইউরোপ ছিল চার্চের একচেটিয়া প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বের অধীন। আর চার্চ খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উপাসনালয় বিধায় ধর্মের কর্ণধার পোপ, পাদ্রী, পুরোহিতরা এই রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা ও ভাগ্যবিধাতা হয়ে দাঁড়াল। সমস্ত জনতা ছিল তাদের অধীন। এই ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসিত স্পেন ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র থেকে খ্রিস্টানরা কিছু কিছু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তা ইউরোপে গিয়ে প্রচার করতে শুরু করে। এর ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে যে মূর্খতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ব্যাপকতা লাভ করেছিল তার বিরুদ্ধে ইউরোপের নব্য চেতনাসম্পন্ন যুবকদের মনে বিদ্রোহের ভাব শুরু হয়। এ সময় 'বেকন' সহ কয়েকজন ইউরোপীয় স্পেনের গ্রানাডাস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছিলেন। সেখানে ইসলামী দর্শন, ইসলামী জীবন বিধান, চিন্তার স্বাধীনতা সম্পর্কে যে জ্ঞানের সন্ধান তারা পান, সেই জ্ঞান নিয়ে ইউরোপে চলে যান। সেখানে গিয়ে তারা চিন্তার স্বাধীনতার ব্যাপক প্রচার আরম্ভ করে।

গীর্জা কর্তৃপক্ষ যখন লক্ষ্য করলো যে, গীর্জার একচেটিয়া কর্তৃত্বকে যুবসমাজ চ্যালেঞ্জ করছে, গীর্জার বাধ্যবাধকতা পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে তারা রাজি হচ্ছে না, তারা চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবি করছে। ফলে এটা গীর্জার জন্য অর্থাৎ গীর্জার একচেটিয়া কর্তৃত্বের জন্য অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে দেখা দিলো। গীর্জা কর্তৃপক্ষ মনে করলেন, চিন্তার এ স্বাধীনতা যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে গীর্জার এই একচেটিয়া কর্তৃত্ব আর থাকবে না। যে কর্তৃত্ব এতোদিন ধরে ভোগ করে আসছে পোপ-পাদ্রী-পুরোহিত তা অচিরেই তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

ফলে গীর্জা কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে এই নব্য চেতনাসম্পন্ন স্বাধীন চিন্তার অধিকারী লোকদের ওপর জুলুম-অত্যাচার শুরু করে দিলো। অন্যদিকে বিজ্ঞানচর্চাও ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গেল গোটা ইউরোপে। গীর্জা কর্তৃপক্ষ সে বিজ্ঞান চর্চাকেও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিলেন। হুকুম জারী হয়ে গেল, কেউ কোনো ধরনের চিন্তা-ভাবনা বা জ্ঞান- চর্চা করতে পারবে না।

কিন্তু লোকদের মনে যখন নতুন চিন্তা-চেতনার স্রোত বইতে শুরু করে তখন তাকে আর সহজে থামানো যায় না। একদিকে এই চিন্তা-চেতনার বিস্তার ঘটতে লাগল আর অন্যদিকে গীর্জার কর্তৃত্ব হুমকির সম্মুখীন বলে জুলুম-অত্যাচারের

মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়াতে লাগল। যার ইতিহাস অত্যন্ত করুণ এবং এতই মর্মান্তিক যে, গীর্জা একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে এর ধর্মভীরু পোপ পাদ্রীরা চিন্তার এ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনকে পুরোপুরি অস্বীকার করল আর যারা এ চিন্তা-চেতনা লালন করে তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করল— তাদেরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হলো। অনেককে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হলো। তাদের অপরাধ ছিল চিন্তার ক্ষেত্রে তারা স্বাধীনতা ভোগ করতে চাচ্ছে। যে ধরনের চিন্তা-চেতনা গীর্জার পাদ্রীরা কোনো দিন জনগণের সামনে পেশ করেনি, স্বাধীন চিন্তার অধিকারীরা তা-ই দাবি করে বসল।

ফলে অত্যাচার ক্রমশই তীব্রতর হয়ে উঠল। আর অত্যাচার যতই বাড়তে লাগল, চারদিকে বিদ্রোহও ততই বাড়তে লাগল। এ বিদ্রোহ আর থামানো গেল না। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে গীর্জা ও রাষ্ট্র আলাদা হয়ে গেল। এ দুইয়ের আর এক থাকা গেল না। অবশ্য ইউরোপীয় সমাজে গীর্জা আর স্বাধীন চিন্তা-চেতনা লালনকারী লোকদের সাথে একটা সমঝোতা হলো। তা হলো এই যে, গীর্জা নিছক ধর্মচর্চা করবে আর রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বৈষয়িক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করবে এবং সেগুলো পরিচালনা করবে। কাজেই এ দু'টির মধ্যে সরাসরি কোনো সম্পর্ক থাকবে না, সে জন্যে এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এভাবে রাষ্ট্র ও গীর্জা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায় পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ রাষ্ট্র গীর্জার ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না আর গীর্জাও রাষ্ট্রের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। ধর্ম বহির্ভূত যাবতীয় বিষয়ের পুরো কর্তৃত্ব থাকবে রাষ্ট্রের কাছে।

এরও পূর্বের ইতিহাস হলো, ইউরোপে প্রথম ছিল সামন্তবাদ। সামন্তবাদ বলতে বুঝায়, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একজন নরপতি; তিনি সে এলাকার সব জমির মালিক এবং সে এলাকার লোকদের ওপর তিনি একমাত্র প্রভু ও শাসক। তার মর্জি পালন করতে এবং তার হুকুম মানতে প্রতিটি মানুষ বাধ্য। মোটামুটি আমাদের দেশের অধুনালুপ্ত জমিদারি প্রথার মতো। অনেকে হয়তো এ বিষয়ে শুনেছেন এবং ইতিহাসেও পড়েছেন জমিদারদের নির্যাতনের কথা। তারা হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন সামন্তবাদের অবস্থা। এক কথায়, এদেশের জমিদারির মতো সামন্তবাদ গোটা ইউরোপে ছায়া বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে সামন্তবাদ ভেঙে যায়। তারপর আসে রাজতন্ত্র ও বংশানুক্রম ক্ষমতা ভোগের পালা। রাজারা বড় বড় এলাকা নিয়ে এক এক রাজত্ব পরিচালনা করত। জনগণ এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে এবং ক্রমে ক্রমে সেটাও খতম হয়ে

যায়। এরপর প্রশ্ন ওঠে, দেশে এখন কী ধরনের শাসন চলবে? আর তা পরিচালনাই বা করবে কে?

সামন্তবাদে এক ব্যক্তি ছিল একটি এলাকার হর্তাকর্তা। ফলে সার্বভৌমত্ব ছিল তারই হাতের মুঠোয়। আবার বড় বড় রাজত্বে রাজা-বাদশাহরা ছিল সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তাদের মর্জিমতো গোটা এলাকার গোটা অঞ্চলের সমস্ত মানুষ জীবন যাপন করত। মানুষের ওপর শাসনকার্য চালাবার নিরঙ্কুশ অধিকারও ছিল তাদের। তাদের মুখের কথাই ছিল রাজ্যের আইন।

ইউরোপের নব্য চিন্তাবিদরা নতুন চিন্তার আলোকে সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্র উভয়কেই উৎখাত করার পর প্রশ্ন জাগল, এখন সার্বভৌমত্ব কার ? কার হুকুমে চলবে দেশ?

ঠিক এ সময়ে পশ্চিম চিন্তাবিদরা এর একটি সমাধান দিলেন— যেহেতু দেশের সকল নাগরিকই দেশের মালিক, অতএব সকলের মত জেনে এবং সকলের রায় নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। এটাকে বলা হয়, জেনারেল উইল বা সর্বসাধারণের মত অর্থাৎ সর্বসাধারণের মত নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। আর এভাবেই আসে 'গণতন্ত্র'। এরপর এ 'গণতন্ত্রের' বাস্তব রূপটা কী হবে তা নিয়েও ইউরোপে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে যে, দেশে কোনো সামন্তবাদ নেই, কোনো রাজা-বাদশাহ বা সম্রাটও নেই; তাহলে সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক প্রকৃতপক্ষে কে হবে ? এই সর্বোচ্চ মালিক কর্তৃত্বধারী হওয়ার ব্যাপারটিকে তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছে। যেমনঃ দেশের নাগরিকদের অধিকার হিসেবে বলা হয়েছে যে, কোনো দেশের সমগ্র জনগণই সে দেশের মালিক। দেশের সার্বভৌমত্ব তাদেরই করায়ত্ত। তারাই সার্বভৌম। তবে একটি দেশের দশ কোটি কিংবা নব্বই কোটি মানুষ সকলে মিলে তো সরাসরি দেশ শাসন করতে পারে না। সেজন্যে তারা বাছাই করে তাদেরই মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পাঠাবে এবং জনগণের পক্ষ থেকে তারাই দেশ পরিচালনা করবে, এটা সর্বশেষ সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়াল। বলা হলো, জনগণ ভোট দেয়ার অধিকারী; তারা যাদেরকে ভোট দেবে তারাই তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে পার্লামেন্টে। এই প্রতিনিধিদের কাজ হলো, ভোটদাতাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং পার্লামেন্টে সেগুলোর সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করা।

এভাবে জনগণের প্রতিনিধিরা হলেন দেশ শাসন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের অধিকারী। এছাড়া মৌলনীতি নির্ধারণ এবং সে জন্যে আইন-কানুন তৈরির যাবতীয় কর্তৃত্ব এই জনপ্রতিনিধিদের হাতে অর্পণ করা হয়।

এরপর প্রশ্ন দেখা দেয়, প্রতিনিধি তো নির্বাচিত হবে; কিন্তু তার পদ্ধতিটা কী হবে ? কেমন করে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে ? এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যে সিস্টেম উদ্ভাবন করেছে তা হলো, রাজনৈতিক দল গঠন করা। একে ভিত্তি করে সমাজে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। জনগণের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বা চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন রকমের নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে এই সকল দল গঠিত হয়। এভাবে বিভিন্ন চিন্তা-চেতনায় একমত লোকেরা একেক দলে সংঘবদ্ধ হয়। এরপর সে সব দলের লোকেরা তাদের মতবাদকে ব্যাপকভাবে জনগণের সামনে পেশ করে এবং পরবর্তীতে জনগণ তাদের মতবাদ সমর্থন করে কি না তা যাচাই হয় ভোটের মাধ্যমে।

এভাবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের একটা বিশেষ অবদান হলো- পলিটিক্যাল পার্টি গঠনের ধারা প্রবর্তন। এ ধারা অনুসারে দেশে পলিটিক্যাল পার্টি হতে হবে; কেননা পলিটিক্যাল পার্টি গঠন করা জনগণের একটি মৌলিক অধিকার— তা দুই-তিনজন মিলে হোক কিংবা বহুসংখ্যক লোক নিয়ে হোক। কিন্তু দেশের জনগণ যেহেতু বিভিন্ন মত পোষণ করে, সেহেতু যে যার মতো করে পার্টি বা দল গঠন করে। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় যখন আসে তখন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় মেনিফেস্টো নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হয়। নির্বাচিত হলে দেশ ও জাতির জন্যে তারা কী কী করবে তার বিস্তারিত বিবরণ জাতির সামনে পেশ করে, যদিও অনেকে নির্বাচিত হয়ে তাদের প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে যায়।

যা হোক পরবর্তীতে এই চিন্তাবিদরা দু'টি পদ্ধতি বের করে। জনগণের ভোটে সরাসরিভাবে সর্বোচ্চ শাসক নির্বাচিত হবে— যার হাতে দেশের সার্বভৌমত্ব থাকবে অথবা জনগণের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিরা দেশের সর্বোচ্চ শাসক নির্বাচিত করবে। এর একটি হলো প্রেসিডেন্সিয়াল আর একটি পার্লামেন্টারি পদ্ধতি।

প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে দেশের সর্বোচ্চ শাসক সরাসরিভাবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত করা হয়; তিনি হন প্রেসিডেন্ট। তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করেন। তাদের মধ্য থেকে

নিজেদের পছন্দমতো লোকদের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন নির্বাচিত ব্যক্তিরা হাতে ক্ষমতা গেলেও দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতেই থেকে যায়। যেহেতু তিনি সরাসরিভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ? সেহেতু এ ক্ষমতা তিনিই ভোগ করেন।

আর পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে জনগণ প্রথমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। তারপর সেই প্রতিনিধিরা তাদের মধ্য থেকে দেশের সর্বোচ্চ শাসক নির্বাচিত করে। তিনিও কোনো-না-কোনো এলাকা থেকে নির্বাচিত অর্থাৎ তিনিও একজন পার্লামেন্ট মেম্বার। এরপর তিনি হন হেড অব দি পার্লামেন্ট বা সংসদ নেতা-লিডার অব দি হাউজ। এভাবেই নিযুক্ত হন দেশের প্রধানমন্ত্রী। আর তারই হাতে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

পরবর্তীকালে এই মূল পলিটিক্যাল চিন্তার আরও কিছু বিকাশ ঘটেছে, তা হচ্ছে, কোনো দেশে এক ব্যক্তির হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকলে সে যেকোনো সময় যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কাজেই একটা ভারসাম্য বা চেক এন্ড ব্যালেন্সের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সেই চেক এন্ড ব্যালেন্সের চিন্তা করতে গিয়ে পার্লামেন্টের নেতা বা প্রধানমন্ত্রীর সাথে একজন প্রেসিডেন্টের কথা চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। পদ্ধতিটা এ রকম যে, প্রসিডেন্ট যিনি হবেন তাকে পার্লামেন্টের মেম্বাররাই নির্বাচিত করবেন এবং তাঁর হাতেও কিছু ক্ষমতা থাকবে। যেমন, পার্লামেন্ট কোনো আইন পাশ করলে সেটা আইন হিসেবে চালু হতে শুধু প্রেসিডেন্টের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর লাগবে। ব্যস, এটুকু ছাড়া আর কিছুই নয়; কারণ পার্লামেন্টে আইন পাশ হয়ে যাবার পর প্রেসিডেন্ট তাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

এর আরও একটি পদ্ধতি আছে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে! সেটা হলো, প্রেসিডেন্ট থাকবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে। পার্লামেন্ট আইন পাশ করলেও সেখানে পার্লামেন্টের নেতা হিসেবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকে, সেহেতু প্রধানমন্ত্রী যাতে বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন করতে না পারে সেজন্য কিছু কিছু ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে দিয়ে দেয়া হয়। তা এই বলে দেয়া হয় যে, প্রেসিডেন্ট যদি কোনো আইনকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য অকল্যাণকর বা ক্ষতিকর মনে করেন তবে তিনি আইনটির ক্ষতিকর দিকগুলোকে চিহ্নিত করে পার্লামেন্টে পুনরালোচনার জন্যে অনুরোধ জানাবেন। এ ক্ষমতাটুকু কোথাও কোথাও প্রেসিডেন্টকে কার্যতই দেয়া হয়, আবার কোথাও কোথাও শুধু নামকাওয়াস্তে প্রেসিডেন্ট থাকেন যার নিজের কোনো ক্ষমতাই থাকে না। তিনি একটা পুতুল অথবা একটি কলম মাত্র। প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে পাশ করা যে

আইনই তার সামনে পেশ করা হবে তাতে তিনি স্বাক্ষর বা সম্মতি দিতে বাধ্য। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেমন এ ধরনের সরকার চলছে। তাই বলতে গেলে পৃথিবীতে দু'টি সিস্টেম চালু আছে— একটি প্রেসিডেন্সিয়াল আর অন্যটি পার্লামেন্টারি সিস্টেম।

পার্লামেন্টারি সিস্টেমে জনগণের ভোটে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন এবং যে দলের অধিক সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন তারাই পার্লামেন্টে গিয়ে সরকার গঠনের লক্ষ্যে একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তবে বাস্তব অবস্থা এই যে, যিনি প্রধানমন্ত্রী হন তাকে আবার সকলের আস্থাভাজন হতে হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব একটা মনোভাব থাকে, আবার তার সামনে দলীয় নানা বাধ্যবাধকতাও থাকে। তবে নেতা যদি যোগ্যতাসম্পন্ন হন তাহলে নিজের মতকে দলের পার্লামেন্ট সদস্যদের দ্বারা খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পারেন।

এ সিস্টেমে সরকার বরাবরই কিছুটা দুর্বলতার মধ্যে থাকে। কারণ দলীয় লোকদেরকে প্রায়শ সন্তুষ্ট রাখার একটা প্রবণতা থাকতেই হয়। তাদের সুযোগ-সুবিধা, দাবি-দাওয়া, তাদের সমর্থকদের চাকরি প্রদান, তাদের এলাকায় রাস্তাঘাট বানানো এরূপ নানান কাজ-কর্মের সুযোগ দিয়ে দলীয় সদস্যদের বাধ্য রাখতে হয়। আবার সুযোগ সন্ধানী স্বার্থবাদী পার্লামেন্ট সদস্যরাও জনগণের স্বার্থ আদায়ের চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে অনেক স্বার্থ আদায় করে নেয়। এরপর যখন এ প্রতিনিধিরা সুযোগ পায় এবং বুঝতে পারে তাদের একটা ভোটের মূল্য অনেক বেশি তখন তাদের মূল্যায়নও হয় অনেক বেশি। সাথে সাথে স্বার্থের পরিমাণও বেড়ে যায়। বস্তুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সৃষ্ট এত সব জঞ্জাল ও আবর্জনার মোকাবিলা করে একটি শক্তিশালী সরকার চলতে পারে না। এ কারণেই এ সমস্ত এলাকায় প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির স্বৈরাচারী চরিত্র

প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমে যেহেতু এক ব্যক্তিই আগে ভাগে দেশের সকল ভোটার দ্বারা নির্বাচিত হয়ে যায় সেহেতু সে ব্যক্তিই হয় দেশের সকল ক্ষমতার মালিক। সে যতদিন আছে ততদিন সরকার স্থিতিশীল। সরকারের কোনো অদল বদল হয় না। সকালে এক সরকার আর বিকেলে অন্য এক সরকার- এ রকম হতে পারে না। (পাকিস্তান আমলে এ রকম ঘটনা এদেশে ঘটেছে)। তবে এটুকু হতে পারে যে, প্রেসিডেন্ট যাদেরকে নিয়ে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন তাদের মধ্য থেকে যদি

কেউ প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা বা মর্জিমতো কাজ না করে বা করতে না চায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেই হলো, তুমি পদত্যাগ করে চলে যাও। যেমন— এখানে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়া ও এরশাদের সময় এ রকম হয়েছে। মোটকথা এ সিস্টেমে এক ব্যক্তি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা পুরোপরি ভোগ করেন।

এদিক থেকে আমাদের দেশে যে প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম চলছে তা আরও ভয়ানক! বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট বার এসোসিয়েশন আয়োজিত এক সেমিনারে আমি পর্যালোচনা করে দেখিয়েছি যে, আমাদের দেশের তৎকালীন সংবিধানে প্রেসিডেন্টের হাতে দেশের সমস্ত ক্ষমতা এমনভাবে চলে গিয়েছে যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এমনকি তাকে প্রায় আল্লাহর সমতুল্য ক্ষমতা (নাউযুবিল্লাহ) দেয়া হয়েছ। তিনি এই ভূখণ্ডে যা খুশি তাই করতে, যাকে ইচ্ছা মন্ত্রী বানাতে এবং যাকে ইচ্ছা সরিয়ে দিতে পারেন। এমনকি তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্টও ভেঙে দিতে পারেন। সংসদ নির্বাচনের পর যদি দেখা যায় যে, প্রেসিডেন্টের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেনি তখন তিনি তার মর্জিমতো পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারেন। এমনিভাবে যখন খুশি তিনি পার্লামেন্ট ডাকবেন। আর যদি না ডাকেন তবে পার্লামেন্টের অধিবেশন হতে পারে না। একবার তো ছয় মাস পর্যন্ত দেশে পার্লামেন্টের অধিবেশনই হয়নি। এখানে প্রেসিডেন্টের স্বৈরাচারী ইচ্ছায় সব কিছু সংঘটিত হয়।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে আমার বক্তব্য

এ পদ্ধতিতে সাধারণত কমসংখ্যক লোকেরা দেশের শাসন চালায়। যেমন ধরা যাক, একটি নির্বাচনী এলাকায় তিন থেকে চার-পাঁচজন পর্যন্ত প্রার্থী থাকে। তার মধ্যে একজন প্রার্থী ভোট পেল ১০ হাজার, একজন পেল ১২ হাজার আর একজন পেল ১৪ হাজার আর একজন পেল ১৫ হাজার। যে ব্যক্তি পনেরো হাজার ভোট পেল সে-ই নির্বাচিত হলো। আর বাইরে থাকল (১০+১২+১৪) মোট ৩৬ হাজার ভোট। তাহলে দেখা গেল, এই ৩৬ হাজার ভোটারের ভোট মাঠে মারা গেল, তাদের সমর্থন কোনো কাজে আসল না। এই অধিক সংখ্যক ভোটারের মত এবং তাদের ইচ্ছা রাষ্ট্রের কাজে কোনো প্রভাব ফেলতে পারল না। অথচ অল্পসংখ্যক ভোট পেয়ে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে গেল প্রচলিত গণতান্ত্রিক সিস্টেমে। এভাবে অল্পসংখ্যক ভোট পেয়েও সদস্যরা পার্লামেন্টে আসে। এরপর আরও মজার ব্যাপার হলো— পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা

সর্বমোট ৩০০ জন । এই ৩০০ জনের মধ্যে অন্তত ১৫১ জন যখন কাউকে সমর্থন করে তবে সে সরকার গঠন করে। এই ১৫১ জন লোকের প্রাপ্ত ভোট যদি গণনা করা হয় আর এর বাইরে যারা রয়ে গেল তাদের ভোট সংখ্যা গণনা করা হয় তাহলেও দেখা যাবে, অনেক ক্ষেত্রে সরকারের বাইরে থাকা লোকদের পক্ষে বেশিসংখ্যক লোকদের সমর্থন (ভোট) রয়েছে। এখানেও দেখা যায় গণতান্ত্রিক সিস্টেমে মাইনরিটি বা কমসংখ্যক লোকই শাসন ক্ষমতার মালিক হয়ে বসে।

এরপর মনে করুন একটা পার্টির মধ্যে ১৬০ জন সদস্য পার্লামেন্ট মেম্বার। এখন সে পার্টির মধ্যে আবার বিভিন্ন নেতার বিভিন্ন গ্রুপ আছে। সে গ্রুপের মধ্যে যার লোকসংখ্যা বেশি তাদের সমর্থিত ব্যক্তি হয় প্রধানমন্ত্রী। অন্য গ্রুপের যে মত তা সেখানে ব্যর্থ হয়ে যায়।

আবার যখন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হয় তখনও ঐ ১৬০ জন সদস্য আর মন্ত্রী-মিনিস্টার হতে পারে না। অল্প কয়েকজন সদস্যই কেবল সে সুযোগ পায়। তাদের হাতেই থাকে দেশের সর্বময় ক্ষমতা। ফলে সরকারের সমর্থনেও যে বাকি সদস্যরা রইলেন তাদের মতও অনেক সময় কার্যকর হয় না। তাদের সপক্ষে যে জনগণ ভোট দিয়েছিল তাদের আশাও পূর্ণ হয় না। এভাবে যেকোনো দিক দিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে, গণতান্ত্রিক সিস্টেমে অল্পসংখ্যক লোকই শাসনের আসল সুবিধা ভোগ করে। অর্থাৎ মাইনরিটি বা কমসংখ্যক লোক দ্বারা দেশ শাসিত হয়। তাই বলতে হয়, গণতন্ত্র আসলে ধোঁকাতন্ত্র– একটা বাস্তব প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ এমন এক প্রতারণা যা দিনের উজ্জ্বল আলোতেই সবাইকে দেয়া হচ্ছে, অথচ কেউ বুঝতে পারছে না। তদুপরি গণতন্ত্রটা একটা বিরাট ধোঁকা হয় তখন যখন একে মেজরটি লোকের শাসন বলে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়।

এই গণতান্ত্রিক সিস্টেমটা ইংরেজরা আমাদের দেশে চালু করে গেছে তাদের দেশ থেকে এনে এবং একে এমনভাবে চালু করে গেছে যে, কমসংখ্যক লোকের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকবে আর বিপুল সংখ্যক লোক তাদের দ্বারা শাসিত হবে। কেননা ইংরেজদের পলিসি হলো, তাদের তৈরী করা যেসব মানব সন্তান তাদের আদর্শের অনুসারী, তাদের চিন্তা-বিশ্বাসের ধারক-বাহক তারা এই দেশের জনসাধারণের মধ্যে সংখ্যায় কম হলেও তাদের হাতেই যেন থাকে দেশের সার্বভৌমত্ব— দেশের শাসনভার স্থায়ীভাবে; তারাই যেন সবকিছু ভোগ করার সুযোগ পায়। বস্তুত সার্বভৌমত্বের দিক দিয়ে এটাই হচ্ছে ইসলাম আর কুফরের মধ্যে পার্থক্য।

লক্ষ্যণীয় যে, গণতান্ত্রিক সিস্টেমে যেহেতু সার্বভৌমত্ব জনগণের সেহেতু জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী তার অংশীদার। তাদের কারো হাতে যখন সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করার সুযোগ আসে তখন তিনি ইচ্ছা করলে দলের লোকদের বাধ্য করে মাত্র কয়েক মিনিটেই গণতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত করে দিতে পারেন।

এই দেশের পার্লামেন্টেই এই ধরনের ঘটনার নজীর রয়েছে। এটা একটা ইতিহাস যে, ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশে মাত্র ১৩মিনিটে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 'হিরো। গণতন্ত্রের জন্য তিনি লড়াই করেছেন, সেজন্য জেলও খেটেছেন। এদেশে তার মতো আর কেউ গণতন্ত্রের জন্য এতো কষ্ট স্বীকার করেনি। গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে তিনি দেশের লোকদের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। সেই কারণে ৭০-এর নির্বাচনে শতকরা ৯৮ ভাগ ভোটও পেয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সেই নেতা ক্ষমতায় এলেন, তারপর ১৯৭২ সনের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ১৯৭৫ সনে এসে তিনি নিজেই (শেখ মুজিব) পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাব পেশ করলে তা মাত্র ১৩ মিনিটে পাশ হয়ে গেল। এভাবে গণতন্ত্রের প্রবক্তা নিজ হাতেই গণতন্ত্র হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি বাকশাল গঠন করলেন। সে ইতিহাস আপনাদের অনেকেরই জানা

তাই বলছি গণতন্ত্রের পরবর্তী রূপ হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র, নিজতন্ত্র, আমিতন্ত্র এবং আমার খুশি-মর্জী-ইচ্ছার তন্ত্র। এদের এই conseption টা ওদের ওখান থেকে শুরু হয়েছে যে, আল্লাহ বলে কেউ নেই। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে নেই, সার্বভৌম হিসেবে নেই, আইন দাতা বা বিধান দাতা হিসেবে কেউ নেই। ফলে এ ধারণাটা মিলে যায় ডারউইনের থিউরির সাথে যে, লেজহীন বানর মানব আকার ধারণ করেছে তবেই মানুষ হয়েছে। গণতন্ত্র যখন স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হয় তখন এটাও বিস্ময়ের কিছু নয়। তাই গণতন্ত্র শুধু লোক দেখানো জিনিস, লোক ভোলানো জিনিস। এর মাধ্যমে জনগণকে বুঝানো হয় যে, তোমরাও দেশের শাসন ক্ষমতার অংশীদার। কার্যত দেশের চালাক-চতুর ও ধূরন্ধর রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা এ কাজ করে। তারা জনগণকে অধিকারের কথা বললেও আসলে ভোটের পর তাদের কোনো কথাই আর মনে রাখা হয় না— এটাই বাস্তব।

আমি এতক্ষণ ধরে গণতন্ত্রের কথাটাই বেশি আলোচনা করেছি এই কারণে যে, আমাদের এদেশে গণতন্ত্রের চর্চাটাই বেশি হয়ে থাকে— লোকেরা এতে সঠিকভাবে বুঝতে পারুক আর না-ই পারুক। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে গণতন্ত্র সবচেয়ে সস্তা বুলি। যে যেভাবে ইচ্ছা এ বুলিটাকে ব্যবহার করে থাকে। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্র ধ্বংস করে ক্ষমতা দখল করেন। সেই এরশাদ সাহেবও নাকি এখন গণতন্ত্র কায়েমে প্রস্তুত। যে গণতন্ত্রে জনগণ ভোট দিয়ে মেম্বার নির্বাচিত করবে আর তারা পার্লামেন্টে গিয়ে আইন বানাবে সেই গণতন্ত্র কায়েমই নাকি তার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ধরনের গণতন্ত্র তো প্রেসিডেন্ট সাত্তারের আমলেও ছিল। তিনিও জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশে মোটামুটি একটা পার্লামেন্টও ছিল জনগণের নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারাই। এরশাদ সাহেব সেটাকে খতম করে বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করে পরের দিনই ঘোষণা করেন, আমি 'গণতন্ত্র' দেবো। তাহলে প্রশ্ন— তুমি যদি গণতন্ত্র দেবেই তবে যে গণতন্ত্র ছিল সেটাকে হত্যা করলে কেন ? খুন করলে কেন সেই গণতন্ত্রকে ? আসলে গণতন্ত্রের কোনো মা-বাপ নেই। এ এমন এক এতিম সন্তান যে, প্রত্যেকই এর বাপ হতে চায়। যারা ক্ষমতা হারালেন তারা আবার যারা তাকে হত্যা করে ক্ষমতায় গিয়ে স্বৈরাতন্ত্র চালিয়েছে তারাও এর বাপ— এর গার্জিয়ান। এক এতিম সন্তানের গার্জিয়ানশিপ নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি চলছে আমাদের দেশে।

মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে প্রচলিত গণতন্ত্রের মূল কথা। সংক্ষেপে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং এ নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশ শাসনের কাজ করে। জনগণ নীতিগতভাবে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হলেও কার্যত তাদের প্রতিনিধিরাই দেশ শাসনের কাজ করে, সার্বভৌমত্ব ভোগ করে এবং যা ইচ্ছা তাই করে। গণতন্ত্রের থিউরিতে বলা হয়েছে : Government of the People by the People for the People— অর্থাৎ জনগণের শাসন, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্যে। এখানে আল্লাহও নেই রাসূলও নেই, কুরআনও নেই, হাদীসও নেই। গণতন্ত্রে আল্লাহর শাসন নয় বরং মৌলিকভাবে জনগণের শাসন তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে জনগণের প্রতিনিধিরা যে আইন পাশ করে সে আইন আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী হলেও জনগণ তা মানতে বাধ্য হয়। পার্লামেন্টে আইন রচনা করার সময় আইন রচনাকারীরা এটা দেখে না যে, আমরা যে আইন রচনা করছি তা আল্লাহর কুরআন ও রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাহ সম্মত, নাকি তার বিরোধী। এসব দেখতে তারা বাধ্য নয়। কেননা গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে সেক্যুলারিজম অর্থাৎ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। আমি প্রথম দিকে বলেছি যে, যখন রাষ্ট্রে গীর্জার একচেটিয়া শাসন ছিল তখন তাকে বলা হতো থিউক্রেসি— ধর্মতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র বা যাজকতন্ত্র। অন্যকথায় ধর্মের দিক দিয়ে যারা নেতা তথা পাদ্রী, পুরোহিত, পোপ— এদের তন্ত্র ছিল ।

প্রায় এক হাজার বছর ধরে তাদের মতবাদ ছিল ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্ব। অর্থাৎ এ মতবাদ অনুযায়ী রাজা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজের ইচ্ছামতো দেশ শাসন করত। পরিণামে যাজকদের সমর্থনে রাজাগণ নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং জনগণের ওপর নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার চালায়। এরপরে রাষ্ট্র আর গীর্জা যখন দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল তখন রাষ্ট্রীয় থিউরি হলো গণতন্ত্র (Democracy) । জনগণের ইচ্ছাটা প্রতিফলিত হবে রাষ্ট্রের প্রশাসন বা রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে, এটা হলো গণতন্ত্র; কিন্তু এই গণতন্ত্রের মধ্যে নীতিগতভাবে আল্লাহকে অনুল্লিখিত রাখা হয়েছে। আল্লাহ বলে কেউ আছে এতে তার কোনো উল্লেখ নেই। এই না থাকার কারণ এই হতে পারে যে, আল্লাহ থাকলেও থাকতে পারেন; কিন্তু মানুষের কায়কারবার, জীবন যাপনে কোথাও আল্লাহর কোনো দরকার নেই। কারণ সেক্ষেত্রে আল্লাহর কিছু করবার নেই, বলবারও নেই। মানুষের জন্যে তাঁর আইন-বিধান দেয়ার কোনো অধিকার নেই আর দিলেও আমরা তা পালন করতে বাধ্য নই। বস্তুত এই চিন্তা-ভাবনা নিয়ে গণতন্ত্রের বুনিয়াদ তৈরি হয়েছে।

গণতন্ত্র ও শূরা-ই-নিজামের তুলনা

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাথে শূরা-ই-নিজামের তুলনা করতে হলে সর্বপ্রথম যে পার্থক্যটা আসবে তা হচ্ছে সার্বভৌমত্বের। ইসলামে সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত। গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব নীতিগতভাবে জনগণের, কিন্তু কার্যত তা জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। সে ভোট ব্যালট পেপারে দেয়া হোক কিংবা মুখে মুখে। এই ভোট দেবার সময় ভোটাররা যাকে ভোটটি দিচ্ছে মুখে উচ্চারণ করুক আর নাই করুক তাকে তারা ভোটের সাথে সাথে এ অধিকারটাও দিয়ে দিচ্ছে যে, তুমি যে আইনটা পাস করবে সেটা আমি মানতে বাধ্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ কি কোনো মানুষকে এ অধিকার দিয়েছেন যে, সে মানুষের জন্যে আইন তৈরি করবে?

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষ আল্লাহর খলিফা। সে কারণে একজন খলিফা যখন তার খিলাফতের দায়িত্ব অন্য কারো ওপর ন্যস্ত করে তখন তার মধ্যে

উল্লিখিত শর্ত লিখিত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ সেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের খিলাফতের বিষয়টা চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত হয়েই আছে। অতএব সেখানে ভোটার তার ভোট প্রয়োগ করার সময় ভোট গ্রহীতাকে কোনো নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব দেয় না। সে কেবল এই কর্তৃত্ব দেয় যে, তুমি পার্লামেন্টে গিয়ে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক যে আইনটা বিধিবদ্ধ করবে সেটা আমি মানবো; তোমার নিজের তৈরি আইন হিসেবে নয়— আল্লাহর দেয়া আইন হিসেবে তার আনুগত্য করবো। এখানেই গণতন্ত্রের ভোট দান এবং খিলাফতের ভোটদানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

এই খলিফাগণ যখন জনগণের খিলাফতের একটা অংশ নিয়ে পার্লামেন্টে যাবে তখন কুরআন মজীদের আয়াত অনুযায়ী সেই পার্লামেন্টের নাম হবে, 'মজলিসে শূরা'। এই সিস্টেমটি আল্লাহ তা'আলার দেয়া। এরই মধ্যে থেকে আমি কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি আপনাদের সামনে ঃ

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

আর তা সেই লোকদের জন্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের রব্ব-এর ওপর নির্ভরতা রাখে। যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জতাসুলভ কাজকর্ম হতে বিরত থাকে আর ক্রোধ হলে তা ক্ষমা করে দেয়। (আশ-শূরা : ৩৬-৩৭)

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার লোকদের পরিচয় দিয়ে কয়েকটি কথা বলেছেন।

প্রথমটি হলোঃ তারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখে।

দ্বিতীয়টি হলোঃ যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জতার কাজ-কর্ম হতে বিরত থাকে। তৃতীয়টি হলোঃ আর যখন তাদের মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয় ।

এরপর আর একটি আয়াত :

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾

যারা নিজেদের রব্বের হুকুম মানে, নামায কায়েম করে, নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে খরচ করে, অর্থাৎ প্রদত্ত রিযিক আল্লাহর বিধান মোতাবেক ব্যয় করে। (আশ্-শূরা ঃ ৩৮)

আলোচ্য আয়াতে 'শূরা বাইনাহুম' কথাটি মুমিনদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর পূর্বে মুসলমানদের কতকগুলো গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেয়, তারা নামায কায়েম করে। তাদের নীতি হলো যে, তারা তাদের পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদি পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করে এবং সে পরামর্শের ভিত্তিতেই আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত রিযিক ব্যয়-বণ্টন করে।

সূরা শূরার এ আয়াতের ভিত্তিতে আমরা বলতে চাই— ইসলামের শূরা-ই-নিজাম হলো মুমিনদের জন্যে। আর খোদ নবী করীম (স)-এর কাছে এ সূরাটি (আশ শূরা) মক্কায় নাযিলকৃত সূরাসমূহের মধ্যে একটি। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে মক্কায় সেই অবস্থার মধ্যেও মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্মীয় যাবতীয় ব্যাপারাদি সুসম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পারস্পরিক পরামর্শের নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন।

সূরা আলে-ইমরানে আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন এই বলে –

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

হে নবী! আপনার সঙ্গী-সাথীদের সাথে অর্থাৎ মুমিন মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করুন। (আয়াতাংশ ঃ ১৫৯)

এখানে 'ফিল আমরে' কথাটির মর্ম হচ্ছে সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদি।

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

যখনই আপনি চূড়ান্তভাবে সংকল্প গ্রহণ করবেন, তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে কাজ শুরু করে দিন। (আয়াতাংশ ঃ ১৫৯)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাওয়াক্কুল গ্রহণকারী লোকদের ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। (আয়াতাংশ ঃ ১৫৯)

এখানে আশ্-শূরার প্রথম যে আয়াতটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে দু'টি প্রসঙ্গ আছে। একটি হচ্ছেঃ আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের পরিচিতি দিয়ে বলেছেন যে, তারা যথারীতি নামায কায়েম করে। অর্থাৎ নামায কায়েম না করলে কেউ মুসলমান থাকে না। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছেঃ তাদের এটাও একটা বড় পরিচিতি যে, পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই তারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। এখানে এ অধিকারটি দেয়া হলো খলীফাদের, যদিও কুরআন মজীদের إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً দুনিয়ার সকল আদম সন্তানই আল্লাহর খলীফা এই আয়াতের ভিত্তিতে।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো ঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

> তোমাদের মধ্য থেকে যারাই ঈমান আনবে ও তদনুযায়ী নেক আমল করবে তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে তিনি দুনিয়ায় খলীফা বানাবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। (আন-নূর : ৫৫)

এখানে আল্লাহর খলীফা হওয়ার জন্যে ঈমানের সাথে সাথে নেক আমলের শর্ত রয়েছে। আমি এ বিষয়কে এভাবে বিন্যাস করেছি যে, আল্লাহর খলীফা তো সাধারণভাবে সমস্ত মানুষ, সন্দেহ নেই, কিন্তু খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবে সকল খলীফার তরফ থেকে সেই লোকেরা যারা ঈমানদার ও আমলে সলেহ করে। যারা বেঈমান এবং আমলে সালেহ করে না তারা মুসলমানদের তরফ থেকে খিলাফতের দায়িত্ব পেতে পারে না।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে দায়িত্ব পালনের জন্যে মানুষের চরিত্রের কোনো শর্ত নেই। সেখানে শুধু এটুকু শর্ত আছে যে, লোকটি যেন পাগল না হয় আর কোনো অপরাধের কারণে জেল খেটে না থাকে। সেই সঙ্গে বয়সে বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। এ ছাড়া যাকে ভোট দেয়া হচ্ছে সে লোকটা ভালো কী মন্দ, ঈমানদার কী বেঈমান, নামায কায়েম করে কী তা তরক করে, সে মদ খায় কী খায় না,

ব্যভিচারে লিপ্ত কি না, ঘুষ খায় কি খায় না ইত্যাকার যত বড় বড় কবিরা গুনাহ আছে এ সকল থেকে সে মুক্ত কি না এ সকল প্রশ্ন এখানে অবান্তর- এর কোনো মূল্য বা গুরুত্ব সেখানে নেই। এ সব প্রশ্ন তোলা বরং পাশ্চাত্য সেকুলার গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে অপরাধ। এ ধরনের বিষয়ে কোনো প্রচারণা চালানো যাবে না কারো বিরুদ্ধে। তাতে সেখানে বরং মানহানির মামলা হতে পারে।

এ জন্যে কুরআন মজীদ এখানে এই শর্ত আরোপ করেছে যে, আল্লাহর তরফ থেকে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে বুনিয়াদী শর্ত হলো এই যে, সে ঈমানদার এবং নেক আমলকারী হবে। এই ধরনের চরিত্রবিশিষ্ট লোকেরা যখন মজলিসে শূরা অর্থাৎ পার্লামেন্টে একত্রিত হবে তখন জাতীয় সামষ্টিক ব্যাপারাদি তথা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বিষয়াদিতে আল্লাহ ও রাসূলের মৌলিক আইন-বিধান প্রয়োগ করবে। এটাই হবে তাদের প্রধান কাজ। তারা নতুনভাবে কোনো মৌলিক আইন রচনা করবে না, সে অধিকার তাদের নেই। তারা সেটা করতেও পারবে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ.

"হুকুম দেয়া এবং আইন রচনা করার মালিক একমাত্র আল্লাহ।"

এরপরে রাসূলের ওপর হুকুম হলো

وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ

> রাসূল তাদের জন্য যাবতীয় উত্তম পবিত্র জিনিস হালাল ঘোষণা করেন, যাবতীয় মন্দ-খারাপ জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেন এবং তাদের ওপর থেকে সব দুরূহ বোঝা ও নিগ্রহকারী শৃঙ্খল— যা তাদের ওপর চেপে বসেছে; ছিন্নভিন্ন করে দেন। (আল আরাফ-১৫৭)

সুতরাং রাসূলের পরে যে মজলিসে শূরাই দায়িত্ব পালন করার জন্য আসবে তার সদস্যরা আল্লাহ ও রাসূলের কাছ থেকে পাওয়া আইনগুলোকে "চূড়ান্ত ডিসাইডেড ব্যাপার' হিসেবে গ্রহণ করবে অর্থাৎ যে সব ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে গেছে সে সব ব্যাপারে নতুন কোনো আইনের প্রয়োজন নেই, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা বসবে। সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এভাবে কার্যকর হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্য আল্লাহর আইন জারী হতে হবে এবং এ জারী করার দায়িত্ব আল্লাহর খলীফাদের ওপরে বর্তাবে। পার্লামেন্ট বা শুরা-ই মজলিসে বসে

তাদের চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের বিষয় যা হবে, তা হবে কেবল এই বিষয় নিয়ে যে, আল্লাহ তো এ আইনটা দিয়েছেন, এখন আমাদের সমাজে এটার প্রয়োগ করা যাবে কীভাবে ? কী কী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা করতে হবে। কী কী পদ্ধতিও কতটুকু গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অন্য কিছু করা বা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নতুন কোনো আইন তৈরি করার অধিকার তাদের থাকবে না।

তাহলে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক সিস্টেমে পার্লামেন্টের মেজরিটি সদস্যরা যে আইনের পক্ষে থাকবে সেটি আইন হিসেবে পাশ হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামী খিলাফত তত্ত্বের ভিত্তিতে মজলিসে শূরা গঠিত হয়েছে ঈমানদার ও নেক আমলকারী লোকদের খিলাফতের দায়িত্ব পালন হিসেবে। কোনো সদস্য আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাতের বিপরীত কোনো মত প্রকাশ করার মতো ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না, আর কেউ তা করবেও না। সে জানে যে, আল্লাহর দেয়া আইনকেই চূড়ান্ত আইন হিসেবে মেনে নিতে হবে। কেননা ঈমানদার হিসেবে সেটাই তার করণীয়। আর বেঈমান লোকদের কোনো স্থান মজলিসে শূরায় থাকবে না। ঈমানদার হিসেবে সে এটাই করবে। কেননা তিনি মনে করেন, আল্লাহর যা ফয়সালা আমারও তারই প্রতি ঈমান। আমি নিজেই সে অনুযায়ী আমল করি। যেমন আল্লাহ ব্যভিচার হারাম করেছেন— এখন দেশ থেকে এটা কীভাবে বন্ধ করা যায়, এ ব্যাপারে কী কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে এসব নিয়ে আলাপ হবে। বন্ধ তো করতেই হবে, এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই, এ নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা নেই। কেননা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ডিসাইডেড ব্যাপার।

এখন মনে করুন আমাদের দেশে বেশ্যা প্রথা চালু আছে। হোটেল-মোটেলে প্রমোদবালা আছে। এছাড়া অফিসে, প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছেয়ে গেছে। এখন এটাকে কীভাবে বন্ধ করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, মহিলাদেরকে পার্লামেন্টে ও অফিস আদালতে নিয়োগ করা হচ্ছে এ সব ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। এছাড়া আরও একটা বিরাট সমস্যার দরুন ইদানীং আমাদের যুবক শ্রেণী বলতে গেলে শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর সেটা হলো ভাঙ-গাজা, আফিম, হিরোইন ইত্যাদির ব্যবহার। বর্তমানে আমাদের সমাজকে এ সব মাদকদ্রব্য তীব্রগতিতে ছেয়ে ফেলছে। এছাড়া মদের ব্যবহার তো রয়েছেই। এ থেকে জাতিকে উদ্ধার করার উপায় কী ? এ ব্যাপারে কোন প্রক্রিয়ায় কাজ করতে হবে ? মদসহ তামাম নেশার বস্তু যে হারাম এ ব্যাপারে শূরার সদস্যদের দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। তবে হ্যাঁ, দ্বিমত হতে পারে আইনের প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে এবং তার ওপরেই আলোচনা হবে, এমনকি এ নিয়ে ভোটাভুটিও হতে পারে। যিনি ভালো টেকনিক উপস্থাপন করতে পারবেন

তারটাই গ্রহণ করা হবে। এভাবে শরীয়তের আইনগুলো একের পর এক আলোচনার মাধ্যমে জারি করতে হবে।

ইসলামী সমাজের দায়িত্বশীল লোকদের দৃষ্টি তো এ দিকে নিবন্ধ থাকবে যে, অন্যায়-অবিচার, জুলুম-পীড়ন যা কিছু হচ্ছে সমাজে সব কিছুকে বন্ধ করতে হবে। কোনো মানুষকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, কেউ কারো মান-মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করবে না। এমনিভাবে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টেরও কার্যক্রম চলবে। এ পর্যায়ে পরামর্শ গ্রহণ করার ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। পরামর্শ তথা আলাপ-আলোচনা করে কাজ করার জন্যে রাসূলে করীম (স) কত তাগিদ করেছেন তা এ থেকেই উপলব্ধি করা চলে। যেমন রাসূলে করীম (স) বলেছেন,

اَشِيْرُوْا عَلَيَّ اَيُّهَا النَّاسُ.

"হে লোকেরা! আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে আমাকে পরামর্শ দাও!"

এ আহ্বানের পর সাহাবায়ে কিরামও পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে ও প্রাণ খুলে নবী করীম (স)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এরপর সমাজ জীবনে ভালো-মন্দ ও সুখ-শান্তি কীভাবে হয় সে সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলেছেন :

اِذَا كَانَتْ اُمَرَائُكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ سَمَحَاءُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا.

"যখন তোমাদের শাসক ও কর্মকর্তাগণ হবে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিরা, তোমাদের ধনশালী লোকেরা হবে তোমাদের মধ্যে অধিক দানশীল এবং তোমাদের সামষ্টিক বিষয়াদিতে পরামর্শ গ্রহণ ব্যবস্থা কার্যকর হবে, তখন পৃথিবীর উপরিভাগ (অর্থাৎ জীবনে বেঁচে থাকা) তার নিম্নভাগের অর্থাৎ মৃত্যুর তুলনায় উত্তম হবে। আর যখন এর বিপরীত হবে অর্থাৎ পরামর্শ দেয়া-নেয়ার ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে না, তখন মৃত্যুই জীবনের তুলনায় উত্তম হবে। (তিরমিযী)

মানুষের বিবেক-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায় ঈমানের পরে। তারপর হলো মানুষের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। এটা হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। আর এ প্রসঙ্গেই রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'কোনো ঈমানদার ব্যক্তিই পরামর্শ থেকে বেনিয়াজ হতে পারে না।' আমি কারো ধার ধারি না, কারো কাছে জিজ্ঞাসা

করার প্রয়োজন মনে করি না কোনো বিষয়ে, আমি নিজে এতো বুঝি যে, সব কাজ আমি একাই করবো— এ নীতি কখনো ঈমানদার ব্যক্তির হতে পারে না।

এ পর্যায়ের আর একটি হাদীসঃ

আল্লাহ তা'আলা কোনো নবী পাঠান নি, আল্লাহ তা'আলা কোনো খলীফা বানাননি, তিনি যখনই কোনো নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন বা কাউকে খলীফা বানিয়েছেন তার জন্য দু'টি ধারা অবশ্য ছিল—

একটিঃ আন্তরিক বন্ধুতার ধারা। এতে সবসময় বন্ধুরা ভালো কাজ করার পরামর্শ দিত এবং তাকে সবাই উদ্বুদ্ধ করতো ভালো কাজ করার জন্যে।

দ্বিতীয়টিঃ আর এক প্রকার লোক থাকত যারা শত্রুতা পোষণ করত এবং সব সময় নবীকে খারাপ কাজের পরামর্শ দিত ও সেই কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ এই শেষের কথাটি থেকে বাঁচতে পারে সে-ই যাকে আল্লাহ বাঁচান।

এক হাদীসে নবী করীম (স) বলেনঃ

'পরামর্শ হলো লজ্জা ও অপমান থেকে বাঁচার দুর্গ। আর মানুষের অমর্যাদা থেকে নিষ্কৃতি পাবার রক্ষাকবচ।'

নবী করীম (স)-এর প্রতি 'পরামর্শ করো' বলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ নাযিল হবার পর তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন— এভাবেঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَغَنِيَّانِ عَنْهَا وَلٰكِنْ جَعَلَهَا اللّٰهُ رَحْمَةً لِّأُمَّتِيْ.

মনে রাখবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল পরামর্শ করার মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু এ পরামর্শকে আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের জন্যে রহমতস্বরূপ বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

مَنِ اسْتَشَارَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْلِمْ رُشْدًا.

অতএব যে লোক পরামর্শ করবে, সে সঠিক পথ কখনই হারাবে না।

وَمَنْ تَرَكَهَا لَمْ يَعْلِمْ غَيًّا.

আর যে ব্যক্তি পরামর্শের ধার ধারল না বরং নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাই কাজ করল সে বিপথগামী হতে এবং চরম ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

এ জন্যে রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে একটি ভাষণে তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছিলেনঃ

হে জনগণ! তোমরা যদি ধারণা করে থাক যে, আমি নিজে আল্লাহর অনুমোদনের ভিত্তিতে তোমাদের এই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি অথবা ইচ্ছে করে তোমাদের ও অন্যান্য সব মুসলমানের ওপর নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ কাজ করেছি তাহলে মনে রাখবে, এ কথা কিছুমাত্র সত্য নয়। যার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি— আমি নিজ আগ্রহে তা গ্রহণ করিনি অথবা নিজেকে তোমাদের বা কোনো মুসলমানের তুলনায় বড় করে তোলার জন্যে তা গ্রহণ করিনি। আমি কখনই তা পাওয়ার লোভ করিনি— না দিনে, না রাতে। এ জন্যে আল্লাহর নিকটও কখনও প্রার্থনা করিনি— না গোপনে, না প্রকাশ্যে। আসলে একটা বড় বোঝা বহন করার জন্যে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে, যা বহন করার সাধ্য আমার নেই। তবে একমাত্র ভরসা, আল্লাহ যদি আমায় সাহায্য করেন। আমি বরং মনে মনে কামনা করছি, এ দায়িত্ব রাসূলে করীম (স)-এর অপর কোনো সাহাবীর ওপর অর্পিত হোক, তিনি এ কাজে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবেন; তাহলে এই খিলাফত তোমাদের নিকট ফেরত যাবে। তখন আমার হাতে করা এ বাই'আত তোমাদের ওপর বাধ্যতামূলক থাকবে না। তোমরা তোমাদের পছন্দ করা কোনো লোকের ওপর তা অর্পণ করবে। আমি তোমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ হয়েই থাকব।

তিনি রাসূলে করীম (স)-এর মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছিলেনঃ

তোমাদের মধ্যে আমার খিলাফত অপছন্দ করে এমন কেউ আছে কি? থাকলে আমি তার সাথে কথা বলে তা দূর করতে চেষ্টা করব।

অতএব যিনি জনগণের খলীফা হন তিনি মনে করেন না যে, আমি একলা। তিনি বরং মনে করেন এদেশে হাজার খলীফা আছেন। সুতরাং আমি একচেটিয়াভাবে কোনো দায়িত্ব বা কোনো কর্তব্য সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না আমার একক মতের ভিত্তিতে।

এতক্ষণ ধরে আমি আপনাদের সামনে প্রচলিত গণতন্ত্র এবং শূরা-ই-নিজাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করতে চেষ্টা করেছি। এর থেকে যদি আপনারা ফায়দা হাসিল করতে পারেন তাহলে আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

১৯৮৬ সনে পাবনা টাউন হলে সুধী সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণের পর সুধীদের প্রশ্নের জবাব

প্রশ্নঃ জনাব, আপনি নিজেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অধীনে সংসদ নির্বাচন করেছেন। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী ?

জবাবঃ জি-হ্যাঁ, আমি তা করেছি, কোনো সন্দেহ নাই। তবে এ কাজ আমি একা করি নি। আমরা যারা পার্লামেন্টারি (সংসদীয়) ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলাম তারা সকলেই করেছি। আমাদের ধারণা ছিল যে প্রথম নির্বাচন, দ্বিতীয় নির্বাচন, চতুর্থ এবং পঞ্চম নির্বাচনের পরে এমন একটি পরিস্থিতি আসবে যখন পার্লামেন্টে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। এই ভাবনা নিয়ে আমরা ১৯৫১ সন থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত কাজ করেছি। এই পথে চলার ভুল-ভ্রান্তি আমি নিজে অনুভব করা সত্ত্বেও দলীয় সিদ্ধান্তের কারণে আমাকে তা করতে হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ হবার পরে পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ বদলে গেছে, এ কথা আপনাদের অজানা নয়।

পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ইসলামী হুকুমত কায়েম করার লক্ষ্যে। শ্লোগান দেয়া হতো— 'পাকিস্তান কা মতলব কিয়া লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'। পাকিস্তান কায়েম করে ইসলামকে আজাদ করো। এই সকল ছিল ১৯৪৫-১৯৪৬ সনের শ্লোগান। সেই সময়কার যারা বেঁচে আছেন তাদের হয়তো এ কথা স্মরণ থাকবে। আমরাও ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সে আন্দোলনে কাজ করেছিলাম।

সে সময়ে এ উপমহাদেশে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল তাতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছাড়া এখানকার ১০ কোটি মুসলমানের সমস্যার আর কোনো সমাধান ছিল না। যে দেশটি কায়েম হয়েছিল ইসলামের নামে, যদিও সে দেশটিতে ইসলাম কায়েম করা যায়নি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত।

কিন্তু বাংলাদেশ হয়েছে কিসের ভিত্তিতে ? বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর যে সংবিধান রচিত হয় তাতে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানের দাবিদার আওয়ামী লীগ বলে আসছে যে, "মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা পাকিস্তান আমলের সব ধ্যান-ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছি।" তাদের মতে, ধর্মভিত্তিক কোনো রাষ্ট্র হতে পারে না। সুতরাং ধর্মভিত্তিক কোনো আদর্শও গ্রহণ করা যায় না। সে জন্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে তারা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

এহেন বাংলাদেশে সংসদীয় রাজনীতির দ্বারা ইসলামী হুকুমত কায়েম করা যে কোনোক্রমেই সম্ভব নয় একথা আমি "প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদই কাম্য" শীর্ষক ছোট পুস্তিকায় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি। আপনারা যারা এ বইটি পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আমি তার মধ্যে যে কারণগুলো দেখিয়েছি সেগুলো বাস্তব। যারা পড়েননি আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো বইটি পড়ে নিতে। এর মাধ্যমে আমি যুক্তি-তথ্য দ্বারা বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, বর্তমানে প্রচলিত সংসদীয় রাজনীতি দ্বারা ইসলামী হুকুমত কায়েম হতে পারে না। কারণ ইসলামী পক্ষের লোকেরা বিপুল সংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পার্লামেন্টে যেতে পারে না। কেননা এই নির্বাচন টাকার নির্বাচন, টাকার খেলা, প্রভাব-প্রতিপত্তির খেলা, ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের খেলা, ব্যালট বাক্সে জাল ভোট ভর্তির খেলা। এ খেলা কোনো ইসলামী আদর্শবাদী লোকেরা খেলতে পারে না। অতএব, তাদের পক্ষে বিজয়ী হওয়া কিংবা নির্বাচনে জয়লাভ— অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কেননা এ ধরনের নির্বাচনে সব রকম জালিয়াতি ও দুর্নীতি করা হবে আর ইসলামী আদর্শের অনুসারী কোনো ব্যক্তির পক্ষে সে সব দুর্নীতি ও জালিয়াতি তথা চরম শরী'আত বিরোধী কাজ করা কখনো সম্ভব হতে পারে না।

আমি ১৯৭০ সনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি, আমার সাথে আরও অনেক ভাই নির্বাচন করেছেন। তারপর ১৯৭৯ সনে পার্লামেন্ট নির্বাচন করেছি আমি। সৌভাগ্য হোক দুর্ভাগ্যই হোক পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম বিপুল ভোট পেয়ে। এরই ধারাবাহিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেছিলাম দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। অবশ্য এর কোনো নির্বাচনেই আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী ছিলাম না। দল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, আমাকে প্রার্থী হতে হবে। আমি দলীয় সে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলাম। এর সাথে সাথে আমাদের মনে এ চিন্তাও কাজ করছিল যে, ইসলামী হুকুমতের কথা— আল্লাহর আইনের কথা পার্লামেন্টের ভিতরেও বলতে হবে। সেজন্যেও আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা মনে মনে অনুভব করতাম; কিন্তু সব কিছুই ভুল প্রমাণিত হলো।

পরবর্তীকালে আমাদের মধ্যে এ উপলব্ধি জেগেছে যে, আমরা এতদিন যা করেছি তা ইসলাম কায়েমের সঠিক পথ নয়। এ পথে ইসলামের বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা নাই। আমি নির্দ্বিধায় বলতে চাই, সত্য প্রকাশ করার জন্যে আমরা যখন জাতীয় পার্লামেন্টের সদস্য ছিলাম তখন জাতীয় বাজেটের ওপর আমি একটি ভাষণ দিয়েছিলাম, সরকারি দলের লোকেরা পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, সে ধরনের ভাষণ আর কেউ দিতে পারে নি। সে ভাষণে আমি ইসলামী হুকুমতের কথাই বলেছিলাম এবং বলিষ্ঠভাবেই বলেছিলাম। সংসদের প্রতিটি

সদস্য এমনকি গ্যালারিতে বসা শ্রোতারা পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, এ রকম ভাষণ তারা কখনো শোনেনি।

কিন্তু সে ভাষণে কোনো শুভ প্রতিক্রিয়া হয়নি। বাস্তবে আমার কথার কোনো স্বীকৃতি মেলেনি। কেননা সেটা ছিল মানবীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে গঠিত পার্লামেন্ট। "সেখানে ইসলামের দাবি নিভৃতে নীরবে কেঁদে মরেছে, তার কিছুই গ্রহণ করা হয়নি।" কাজেই আমি সিদ্ধান্ত করেছি "ঐ ভ্রান্তপথ নয় ইসলাম কয়েমের জন্যে।"

ইসলাম কয়েমের জন্যে সে পথই একমাত্র পথ যা রাসূলে করীম (স) দেখিয়েছেন এবং তিনি অনুসরণ করেছেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, রাসূলে করীম (স) যখন মক্কায় ছিলেন তখন মক্কাকেন্দ্রিক প্রশাসনের তরফ থেকে তাকে একাধিক প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তাকে এ প্রস্তাবও দেয়া হয়েছিল যে, আমাদের কোনো বাদশাহ নেই-নেতা নেই, তুমি আমাদের বাদশাহ হতে চাইলে আমরা তোমাকে বাদশাহ বানাবো। কিন্তু রাসূলে করীম (স) তা স্বীকার করেননি। আমরা রাসূলে করীম (স)-এর অনুসৃত এই কর্মনীতির মর্মবাণী এতো অন্ধভাবে গ্রহণ করিনি আগে। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে উপলব্ধি বা চেতনা জেগেছে। আমরা বিবেচনা করেছি যে, সংসদীয় পথে আর কোনো কাজ হবে না— ইসলাম কায়েম হবে না । তাই এই পথে চেষ্টা করা, সময়-শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা হবে একেবারেই অর্থহীন। বিগত বছরগুলোতে বহু চেষ্টা করা হয়েছে তাতে সময়ক্ষেপণ আর অর্থব্যয় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। কাজেই ঐ পথ আমরা পরিহার করেছি।

প্রশ্নঃ আগামী সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন অংশগ্রহণ করবে কি ?

জবাব ঃ নিশ্চয়ই না। প্রচলিত ধারার কোনো নির্বাচনেই ইসলামী ঐক্য আন্দোলন অংশগ্রহণ করবে না। ইসলামী ঐক্য আন্দোলন যে সংগ্রাম করছে তার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম একটি ইসলামী সংবিধান রচিত হবে। সেই সংবিধানের অধীনে যদি নির্বাচন হয় তবে সেই নির্বাচনে তারা অংশ গ্রহণ করবে, তার আগে নয়।

প্রশ্ন: জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য কী ? একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?

জবাব ঃ একটু বুঝিয়ে বলতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে। তবুও সংক্ষেপে বলছি, এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মওদূদী সাহেবের বই-পত্রের সাথে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বোধ হয় আমারই পরিচয় ঘটে ১৯৪৫ সনে কলকাতায় বসে এবং সেই বই-পত্র পড়ে

আমি তার সাথে যোগাযোগ করি এবং জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। তদনুসারে কাজ শুরু করি ১৯৪৬ সন থেকে। ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে এলাহাবাদ অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে এই অঞ্চল থেকে আমি যোগদান করেছিলাম। তারপর থেকে আমি এ দলে থেকেই কাজ করতে থাকি।

পাকিস্তান হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার ২০৫, নবাবপুর রোডে অফিস করে মওলানা মওদূদীর বই-পত্রগুলো বাংলায় অনুবাদ করা, এ আন্দোলন চালিয়ে নেয়া, লোকদের মাঝে আন্দোলনের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া ইত্যাকার কাজ বলতে গেলে আমাকে একাকী করতে হয়েছে, করেছি আল্লাহর মেহেরবানিতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার তাগিদে।

জামায়াতের সেই আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল আসলে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারার ভিত্তিতে যা তিনি পত্রিকা তরজুমান কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। এর আগের ইতিহাস হলো, ১৯৪১ সনে ভারতের আলীগড় ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে তাকে আহ্বান করা হয়, আপনার প্রস্তাবিত ইসলামী হুকুমত কীভাবে কায়েম হতে পারে সে বিষয়ে আপনি বক্তব্য রাখুন। তদনুসারে এস্ট্রেচী হলে তাকে এর ওপরে একটি ভাষণ দিতে হয়। উর্দু ভাষায় দেয়া সে ভাষণটি পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। যার নাম ছিল "ইসলামী হুকুম কিসতারাহ কায়েম হোতি হ্যায়।" এর মধ্যে একটি অধ্যায় ছিল ইসলামী ইনকিলাব কি সাবিল– 'ইসলামী বিপ্লবের পথ'। এই বইটি আমিই বাংলায় অনুবাদ করেছি এবং এর নামকরণও করেছি 'ইসলামী বিপ্লবের পথ'। এতে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর জীবন ইতিহাস আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, তার জীবনটাই ইসলামের বিপ্লবী জীবন। মদীনায় যে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছিল সেটা ইসলামী বিপ্লবেরই পরিণতিতে হয়েছিল। কাজেই আমি সে বিপ্লবের দাওয়াত পেয়েই প্রথমে মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তখন থেকে জামায়াতে ইসলামীর কাজ করতে থাকি। মাঝখানে ১৯৪৭ সনে পকিস্তান কায়েম হয়ে যায়।

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর আমরা এই দেশেই 'ইসলামী হুকুমত' কায়েম করার জন্য ১৯৪৮ সন থেকে আন্দোলন শুরু করি। ১৯৪৮ সনের মে মাসে মওলানা মওদূদী করাচীর এক জনসভায় চার দফা মূলনীতি দাবি করেন পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ইসলামী করার উদ্দেশ্যে। সে দাবিগুলো ছিল রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, প্রশাসনে কুরআন ও সুন্নাহর আইন, ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী শরিয়তকে প্রয়োগ ইত্যাদি। অতঃপর পাকিস্তানের সর্বত্র এই আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তারই পরিণতিতে ১৯৪৯ সনের ২৩ শে মার্চ পাকিস্তানে আদর্শ

প্রস্তাব গৃহীত হয়। বলতে গেলে সে আদর্শ প্রস্তাবে এ দাবিগুলোকে একটু ভিন্ন ভাষায় মেনে নেয়া হয়। এটা কিন্তু ছিল একটা আন্দোলন আর এ আন্দোলনটা পুরোপুরি সফলও হয়েছিল।

এভাবে আদর্শ প্রস্তাব পাশ হবার পর আমরা দেশের জন্যে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরি করার আন্দোলন শুরু করি। এই আন্দোলনও সারা দেশব্যাপী চলতে থাকে। এরই ফলে ১৯৫৬ সনে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়।

কেবলমাত্র পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, দেশটি এখন ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়েছে— যেমন একটি লোক কালেমা পড়েছে যে ছিল অমুসলিম। এখন তাকে ইসলামী হুকুম-আহকাম শিখিয়ে পাক্কা মুসলমান বানাতে হবে। এই মূলনীতির ভিত্তিতে। এখন আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, বর্তমান পাকিস্তানের নেতৃত্ব ফাসিক-ফাজির লোকদের হাতে। এদেরকে সরিয়ে যদি ঈমানদার, চরিত্রবান ও নেককার লোকদেরকে বেশি সংখ্যায় পার্লামেন্টে পাঠাতে পারি তাহলে স্বাভাবিকভাবে বিনা রক্তপাতে, বিনা আন্দোলনে, বিনা সংঘর্ষে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে যাবে। আমাদের হিসাব-নিকাশ কতকটা এ রকম ছিল যে, প্রথম নির্বাচনে আমরা শতকরা ২৫টা, দ্বিতীয় নির্বাচনে শতকরা ৩৫টা, তৃতীয় নির্বাচনে ৪৫টি এবং ৪র্থ নির্বাচনে শতকরা ৫৫টি আসন পাবো। আর সংসদে শতকরা ৫৫টি আসন পেলে তো আমরা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে সক্ষম হবো। কিন্তু সিদ্ধান্তের ফল যে কখনো কখনো উল্টাও হয়ে যেতে পারে তা কখনো আমরা ভেবে দেখিনি।

আপনারা অনেকেই জানেন, ১৯৫৮ সনে আইয়ুব খান সামরিক আইনের সাহায্যে আমাদের সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম বানচাল করে দিয়েছিল। তারপর আর কোনোদিন ইসলামী হুকুমত হলোই না পাকিস্তানে। এই ইতিহাস থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, জামায়াতে ইসলামী মূলত ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনকারী একটি বিপ্লবী দল হিসেবেই যাত্রা শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে দলটি বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেছে ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে। কিন্তু “গণতন্ত্র উদ্ধার” কখনও এর আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল না। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য থেকে কখনো আমরা বিচ্যুত হইনি।

কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এখানে গণতন্ত্র উদ্ধার করলেই ইসলামী হুকুমত কায়েমের পথ কিছুমাত্র সুগম হবে না। কেননা যারাই এখানে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসবে, তারা গণতন্ত্রের বড় বড় প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের মিত্র নয়। তারা ইসলামী

আন্দোলনকে কখনও চলতে দেবে না।[১] এখানে ক্ষমতায় যারা আসবে তারা আমাদের পরিচিত, তারা ইসলামের সহায়ক শক্তি নয়— কাজেই এখানে গণতন্ত্র উদ্ধার বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনর্বহালের লক্ষ্যে আন্দোলন করার কোনো অর্থই নেই।[২] এখানে সোজাসুজি ইসলামী হুকুমত কায়েমেরই আন্দোলন করতে হবে। ইসলামী ঐক্য আন্দোলন সেই কাজই করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : নবী করীম (স)-এর নবুয়্যাত প্রাপ্তির সময় তৎকালীন আরবের সমগ্র জনগোষ্ঠী আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিলনা। কিন্তু বর্তমান সময় অধিকাংশ আল্লাহ ও ইসলামকে বিশ্বাস করে। তাহলে ঐ সময়ের কাজের যে ধারা ছিল এখনকার কাজের ধারা কি সেই একই রূপ হবে?

জবাব : এ ব্যাপারে একটা বড় বিভ্রান্তি বা ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে। আমরা অনেকেই মনে করছি যে, রাসূলে করীম (স) যখন মক্কায় তওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন মক্কার লোকেরা বুঝি আল্লাহকে একদম স্বীকারই করত না। এ কথা আসলে কুরআনের খেলাফ। কুরআন মজীদের এ আয়াতটি আপনারা পড়ে দেখুন ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾

হে নবী, তুমি যদি মক্কার ঐ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে এই আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? ওরা নিশ্চয় বলবে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। (যুখরুফ-৪৯)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ওরা আল্লাহকে মানত, কিন্তু আল্লাহর সাথে তারা শরীকও করত; অর্থাৎ ওরা তওহীদে বিশ্বাসী ছিল না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে এক ও একক এই বিশ্বাস তাদের ছিল না। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধারণা ছিল তাদের মধ্যে। যেমন কেউ কেউ ধারণা করত যে, এ বিশাল সৃষ্টির ব্যাপারে নিশ্চয়ই বড় বড় দেব-দেবী আল্লাহর সাথে শরীক রয়েছে। আল্লাহর একার পক্ষে কি এই বিশাল আসমান-জমিন সৃষ্টি করা সম্ভব ? এই মনোভাব নিয়ে তারা

---

১. কেননা, সেক্ষেত্রে তারা জনগণের ম্যান্ডেটের দোহাই দিয়ে ধর্মহীন শাসন চালানোর চেষ্টা করবে এবং ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টাকে রুখে দাঁড়াবে।

২. মওলানা সাহেব একথাটি বলেছিলেন ১৯৮৬ সালে। এরশাদের স্বৈর-শাসনকালে। তার চার বছর পর দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে। তদবধি গণতান্ত্রিক শাসনও যথারীতি চলছে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের পথ তাতে কিছুমাত্র কুসুমাস্তীর্ন হয়নি, বরং কন্টকীর্ণ হয়েই চলেছে প্রতিনিয়ত।-সম্পাদক।

আল্লাহর সাথে অনেককে শরীক করত আর পূজা করত তাদের মূর্তি বানিয়ে। তাদের ধারণা ছিল এদের পূজা করলে আল্লাহ খুশি হবেন।

তাই কুরআন মজীদে প্রশ্ন করা হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللهِ زُلْفىٰ.

তোমরা এই মূর্তিগুলোর পূজা করছ কেন ? এরা কি তোমাদের ভালো-মন্দ কিছু করতে পারে ? ওরা বলত, না, না ওদের পূজা করলে ওরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট নিয়ে যাবে।

মোটকথা আল্লাহর কাছে পৌঁছানো তাদেরও লক্ষ্য ছিল। আমি একদিন জনৈক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ আচ্ছা তোমরা নিজেদের হাতে কাদামাটি আর খড়কুটা দিয়ে বানানো এই মূর্তিগুলোকে পূজা করো, ভোগ দেও। তোমরা কি মনে করো ঐগুলো তোমাদের ভগবান ? উত্তরে ব্রাহ্মণ বললো ঃ না না, আমরা কখনো তা মনে করি না। আমরা ওদের পূজা-উপাসনা করি আসলে ভগবানের কাছে আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে। এটাই হচ্ছে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

এদিক দিয়ে আপনারা বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখুন। আমরা মুসলমান আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানি, স্বীকার করি একথা সত্যি। কিন্তু আল্লাহর সিফাত اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ "সার্বভৌমত্বের মালিক, আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ— এটা কি আমরা মানছি ? না, আল্লাহ বিশ্বাসী মুসলমানরাই তা মানছি না। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আমরা নিজ হাতে তুলে নিচ্ছি। আমাদের রাষ্ট্রকর্তারা প্রত্যেক জুমার দিন মসজিদে গিয়ে নামায পড়েন, তারা ধর্ম পালন করেন আল্লাহকে খুশি করার জন্যে। কিন্তুরাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সার্বভৌমত্ব যেখানে ব্যবহার করা দরকার সেখানে তারা আল্লাহর ধারও ধারে না। সেখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। রাসূলের জামানায় মক্কার লোকদেরও ঠিক ঐ অবস্থা ছিল। একে তওহীদের দাওয়াত বলা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন, তিনি মানুষের পালনকর্তা ও আইনদাতা; তিনি মানুষের ইবাদত-বন্দেগী পাওয়ার সাথে সাথে সর্বক্ষেত্রে তার আনুগত্য পাওয়ারও একমাত্র অধিকারী।

যেমন আল্লাহ বলেছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ.

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের। (সূরা নিসাঃ ৫৯)

এ আয়াত মোতাবেক ইসলামের গোটা ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষত রাষ্ট্রীয় শাসন-প্রশাসনে মূল আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। একজন মুসলমান সর্বপ্রথম আল্লাহর বান্দা এরপর সে অন্য কিছু, দ্বিতীয় বুনিয়াদ হচ্ছে রাসূলের আনুগত্য। মূলত এটা কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র আনুগত্য নয়, বরং আল্লাহর আনুগত্যেরই একমাত্র বাস্তব পথ।

রাসূলে করীম (স) এই তওহীদী আকীদাটি ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়।

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

স্রষ্টার নাফরমানি করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য নষ্ট করে, তার নাফরমানি করে কোনো মানুষের কিংবা অন্য কোনো শক্তির আনুগত্য করা যাবে না।

এটা সুস্পষ্ট যে, এই তওহীদী আকীদা অনুযায়ী মুসলমানদের জীবন এখন আর পরিচালিত হচ্ছে না। মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, পারিবারিক জীবন, অর্থনীতি, সমাজনীতি এসব কিছুই এখন ইসলামের বিপরীত। মুসলমানদের দায়িত্বশীল লোকেরা মনে করেন যে, এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের কোনো দরকার নেই। মানুষের তৈরি আইনই যথেষ্ট। আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে হয়তো তারা মানেন, হয়তো নামায পড়েন, রোযাও রাখেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা তাওহীদী আকিদা অনুযায়ী আল্লাহর দাসত্ব করছে না। তাই বলতে হয়, তওহীদের দৃষ্টিতে তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থার মৌলিকভাবে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

***

MOULANA ABDUR RAHIM (R.) RESEARCH FOUNDATION
ESTD 2008

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৮৫/১-এ (৪র্থ তলা), পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।